একটি
THE BUSINESS STANDARD
প্রকাশনা

০৬ পৌষ ১৪৩১ | সংখ্যা ১৬২
SATURDAY 21 DECEMBER, 2024

ঘাতক ছায়া

র‍্যাব
শেন বেত
গেস্টাপো
কেজিবি
সাবাক
সেকুরিতেত
ডিনা
ওসিএমএসএএ
চেকা

র‍্যাব ও গুম যখন সমার্থক হয়ে উঠেছিল

সৈয়দ মূসা রেজা

‘রাত এগারোটার দিকে মেসে ফেরার পথে র‍্যাবের হাতে পড়ে গেলাম। বেঁটে একজন আমার দিকে এগিয়ে এল। তার মাথায় কালো ফেট্টি নেই। চোখে চশমা। চশমা পরা র‍্যাব প্রথম দেখছি। র‍্যাবদের চোখ ভালো। কেউ চশমা পরে না। তারা খালি চোখেই অনেক দূর দেখতে পারে।

তোমার নাম?

স্যার, আমার নাম হিমু।

তুমি কী কর?

ফেরিওয়ালা চা-কফি ফেরি করি।

ফ্লাস্কে কী?

একটা ফ্ল্যাস্ক খালি। অন্য ফ্ল্যাস্কে অল্প কিছু কফি আছে। ঠান্ডা হয়ে গেছে। ঠান্ডা কফি খাবেন স্যার? হাফ প্রাইস।

ফ্ল্যাস্ক খুলে ফ্ল্যাস্কের ভেতর কী আছে দেখাও।

আমি দেখালাম। ফ্লাস্ক উপুড় করতে হলো। কফির ফ্ল্যাস্ক উপুড় করতেই কফি পড়ে গেল।

বালতিতে কী?

পানি।

দেখাও।

পানিও দেখালাম।

তোমার বগলে কী?

একটা বই স্যার।

কী বই?

জঙ্গি বই স্যার। বিরাট এক জঙ্গির জীবনকথা। জঙ্গির নাম চেঙ্গিস খান। নাম শুনেছেন কি না, জানি না।

দেখি বইটা।

র‍্যাবের এই লোক (কথাবার্তায় মনে হচ্ছে অফিসার) বই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন।

বইটা কার?

আমার মামাতো বোনের মেয়ের। মেয়ের নাম মিতু। ভিকারুননিসা স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ে। ছাত্রী খারাপ না। স্যার, আমি কি এখন যেতে পারি?

না। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে।

আমি আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, স্যার, ক্রসফায়ার হবে?

অফিসার জবাব দিলেন না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই র‍্যাবের এক গাড়িতে চড়ে বসলাম। গাড়ি প্রায় উড়ে চলছে। এয়ারপোর্ট রোড ধরে যাচ্ছি। যানবাহন কম। র‍্যাবের গাড়ি দেখেই মনে হয় অন্যরা পথ করে দিচ্ছে। পোঁ পোঁ অ্যাম্বুলেন্সকেও কেউ এত দ্রুত পথ ছাড়ে না।

র‍্যাবের অফিসার ড্রাইভারের পাশের সিটে বসেছেন। এখন তার চোখে কালো চশমা। রাত নয়টায় কালো চশমা মানে অন্য জিনিস। আমি অফিসার স্যারের দিকে তাকিয়ে অতি আদবের সঙ্গে বললাম, স্যার, আমার চোখ বাঁধবেন না? কেউ জবাব দিল না। পুলিশের সঙ্গে র‍্যাবের এইটাই মনে হয় পার্থক্য। পুলিশ কথা বেশি বলে। র‍্যাব চুপচাপ। তারা কর্মবীর। কর্মে বিশ্বাসী।’ (হলুদ হিমু কালো র‍্যাব, হুমায়ূন আহমেদ)

২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ, বাংলা ১৪১১। ১৪ এপ্রিল। ১ বৈশাখ। বাংলাদেশের র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা সংক্ষেপে র‍্যাব অপারেশনে নামে। পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠানের বিভিন্ন স্থানে পাহারা দিতে মোতায়েন করা হয়েছিল র‍্যাবের প্রায় ২০০ সদস্য। কালো শার্ট। কালো প্যান্ট। চোখে সানগ্লাস। মাথায় কালো ফেট্টি। এভাবেই তাদের প্রথম দেখল দেশের মানুষ।

এ বাহিনী একটা দুঃস্বপ্নের দানবে পরিণত হবে। হত্যা, গুম বা অপহরণের মতো বর্বরোচিত কাজ বিনা দ্বিধায় করবে, তখন কেউ ভাবতেও পারেনি। গত দেড় দশকের বেশি সময় ধরে এ বাহিনীর এবং মানবতাবিরোধী সব অপরাধ সমার্থক হয়ে উঠেছিল। অতীতে শিশুকে ঘুম পাড়ানো একটি ‘প্রযুক্তি’ ছিল ভয়ের গল্প বলা। বা ভয় দেখানো। এভাবেই ভূতুড়ে গল্প, রাক্ষস-খোক্কসদের রূপকথা এ দেশে ব্যবহৃত হতো। হয়তো এমনকি ‘লাল পাগড়ির’, ঔপনিবেশিক পুলিশ বোঝাতে, ভয়ও দেখানো হতো। একই ধারাবাহিকতায় ‘র‍্যাব আইল’ বলে ঘুমপাড়ানি গান গাওয়ার চল আছে কি না, এখনো জানা যায়নি।

এদিকে একই বইতে আটক অবস্থায় খানিক জেরার পর র‍্যাবকে একটা ছড়া শোনায় হিমু।

খোকা ঘুমাল পাড়া জুড়াল
র‍্যাব এল দেশে
সন্ত্রাসীরা ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে?

সন্ত্রাসীরা ধান খেল কি খেল না, সেটা গুরুত্বের বিষয় নয়। অনিবার্য প্রশ্ন হলো–খোকা জেগে থাকলেই কী দেশে র‍্যাব আসতে পারত না?

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পার্টি বা বিএনপি ক্ষমতায় থাকার সময়ই র‍্যাব গঠন করা হয়। প্রথম দিকে অবশ্য র‍্যাবের তৎপরতা জনগণকে আশ্বাস জুগিয়েছিল। কিন্তু প্রবচনের বর্ণিত যায় দিন ভালো আসে দিন খারাপের বক্তব্যকে সত্য

প্রচ্ছদ: মাহতাব রশীদ

সাপ্তাহিক ইজেল, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড-এর একটি প্রকাশনা, ৪/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা ১০০০। বিজ্ঞাপন: ০১৭১১৫৪৭০৫০ tbs.features@gmail.com tbsnews.net

সে সময় একমাত্র চালু টিএফআই কেন্দ্র পরিচালনা করত র‍্যাবের গোয়েন্দা শাখা। এটি পরিচালিত হতো র‍্যাব সদর দপ্তরের আওতায়। উত্তরা র‍্যাব ১ ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরের প্রাচীরঘেরা চত্বরে এই কেন্দ্রটি ছিল।

প্রমাণ করে দিয়ে দেড় দশকের বেশি সময় ধরে আওয়ামী লীগের শাসনামলে এ বাহিনী শেখ হাসিনার সিক্রেট ফোর্সে পরিণত হয়। হয়ে উঠে গুমের অসুর এবং নরঘাতক দানবে। ৩৬ জুলাই নতুন স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে এ বাহিনী বিলোপের দাবি উঠেছে। এ দাবিতে শরিক হয়েছে বিএনপিও।

র‍্যাব গঠনের অধ্যাদেশেই এ বাহিনীকে আইনগত সুরক্ষা দেওয়া হয়েছিল। অধ্যাদেশের ১৩ নং ধারা র‍্যাবকে আইনগত সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করেছিল। এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী ‘সদিচ্ছা প্রণোদিত’ হয়ে র‍্যাব কিছু করলে সে জন্য তার বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেওয়া যাবে না। একই সাথে ‘সদ্দিচ্ছা প্রণোদিত’ কাজের কোনো ব্যাখ্যা অধ্যাদেশে রাখা হয়নি। র‍্যাবকে এমন সুরক্ষা দেওয়ার বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছিল বাংলাদেশের কোনো কোনো দৈনিক।

বেসামরিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও র‍্যাব সদস্যদের অপরাধের বিচার করার ট্রাইব্যুনালের সাথে সামরিক আদালতে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বা এইচআরডব্লিউর প্রকাশিত ২০২১-এর নিবন্ধে এটি প্রকাশ করা হয়েছিল।

২০০৪-এর ১৫ জুলাই র‍্যাবের হাতে এক ব্যক্তি আটক হওয়ার ১০ ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়। আটক অবস্থায় আঘাতের কারণে তার মৃত্যু হয়। এ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রথম র‍্যাবের বিরুদ্ধে বিতর্কের সূচনা হয়েছিল। এর মধ্যে দিয়ে আরও কিছু বিতর্কমূলক ঘটনা ঘটে। ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই এ কথা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে র‍্যাব মানবাধিকারের বেড়া ভাঙতে মোটেও পিছপা নয়। সে সময়ই ‘ক্রসফায়ার’ শব্দটিও হরহামেশা শোনা যেত। ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জুন প্রকাশিত এইচআরডব্লিউর একটি প্রতিবেদনের নাম ছিল–ক্রসফায়ার: কনটিউড হিউম্যান রাইটস অ্যাবিউসেস বাই বাংলাদেশস র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন। ২০০৯ থেকে ২০১১-এর মধ্যে র‍্যাবের হাতে ৭০০-এর বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। ডিডব্লিউর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে আলোচিত গুমের ঘটনা ঘটেছিল র‍্যাব সৃষ্টিরও অনেক আগে। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে ৩০ জানুয়ারি মিরপুর থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়েছিলেন জহির রায়হান। এবারের গণ-আন্দোলনে জহির রায়হানের ‘আরেক ফাল্গুন’ উপন্যাসের একটি পঙ্‌ক্তি বারবার ব্যবহার হয়েছে। এ পঙ্‌ক্তি হলো–আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো। উপন্যাসের পঙ্‌ক্তি বাস্তব হয়ে সত্যিই দেখা দিয়েছিল জুলাই আন্দোলনের দিনগুলোতে। আসছে ফাল্গুনের জন্য দেরি করতে হয়নি। বরং প্রায় দিনে দিনে দ্বিগুণ হয়েছে। আন্দোলনের ভরা কাটালে শিক্ষার্থী-জনতার জোয়ার নেমেছে। অন্যদিকে ৩৬ জুলাইয়ের স্বাধীনতার পর গ্রাফিতি আঁকা হয়েছে, ফাল্গুনের আগেই আমরা দ্বিগুণ হয়েছি।

গুমের এই ভয়াল সংস্কৃতিও দ্বিগুণ নয়, বহু গুণে বেড়ে ফিরে এসেছিল শেখ হাসিনার শাসনের ১৬ বছরে। আন্দোলনের নজিরহীন সুনামির মুখে জান বাঁচানোর দায়ে ভারতে ভেগে যেতে বাধ্য হয় শেখ হাসিনা। পালায় না বলে যে জপমালা শুনিয়েছিলেন, তাকে বাতিল কাগজের মতোই ছুড়ে ফেলতে দ্বিধা করতে হয়নি।

বাংলাদেশ ২.০ অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরই গুম তদন্ত কমিশন গঠন করে। কমিশনের তদন্তে উঠে এসেছে গুম সংস্কৃতির নীলনকশা গত ১৫ বছর ধরে সুনির্দিষ্টভাবেই প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছে। দেশ নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থাগুলোর মধ্যে এ কাজে গুরুত্বের সাথে র‍্যাবের নাম উঠে এসেছে।

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে এ কমিশন ১৪ ডিসেম্বর অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন পেশ করে। এতে আরও বলা হয়েছে, নিরাপত্তা সংস্থার সদস্যরা প্রায় সাদাপোশাকে তৎপর থেকেছে। এক সংস্থা নিজের তৎপরতার দায় ভুয়াভাবে অন্য সংস্থার ঘাড়ে চাপিয়েছে। যেমন সেনা গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই যদি অভিযান চালিয়ে থাকে, তবে তারা নিজেদের র‍্যাব সদস্য বলে দাবি করত। অন্যদিকে যদি র‍্যাব জড়িত থাকত, তবে একইভাবে সেনা গোয়েন্দা সংস্থার নাম বলত। আর র‍্যাব জড়িত থাকলে পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থা ডিবির নাম নিত।

তুলে আনা বা ধরে আনা হতভাগাদের বিনিময়ের প্রথা নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর মধ্যে চালু ছিল। এক বাহিনী অপহরণের কাজ করত। অন্য বাহিনী আটক ব্যক্তিকে জেরা করত। এ ছাড়া তৃতীয় বাহিনী হাতে তুলে দেওয়া হত্যা বা মুক্তির জন্য।

ঢাকা থেকে নিখোঁজ কিন্তু পাওয়া গেছে ভারতে–এমন ঘটনাও ঘটেছে। বিএনপি নেতা সালাউদ্দিন আহমদের বেলায় এমনটি ঘটেছে। বিএনপির আত্মগোপনকারী নেতাকে ২০১৫ সালে উত্তরা থেকে আটক করা হয়েছিল। পরে তাকে ইন্ডিয়ান বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তাকে নির্জন কারাকক্ষে আটক রাখা হয়েছিল। সেখানে একটি গর্তে তাকে প্রাকৃতিক কাজকর্ম সারতে

হতো। তাকে টিএফআই লেখা একটি কম্বল দেওয়া হয়েছিল। টাস্কফোর্স ফর ইন্টারগেশন সংক্ষেপে টিএফআই হিসেবে লেখা হয়।

সে সময় একমাত্র চালু টিএফআই কেন্দ্র পরিচালনা করত র‍্যাবের গোয়েন্দা শাখা। এটি পরিচালিত হতো র‍্যাব সদর দপ্তরের আওতায়। উত্তরা র‍্যাব ১ ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরের প্রাচীরঘেরা চত্বরে এই কেন্দ্রটি ছিল।

সালাউদ্দিন জানিয়েছেন যে তাকে ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ সীমান্তে নিয়ে ভারতীয় কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, হস্তান্তরের সময় পরিচয় যেন ফাঁস হয়ে না যায়, সে জন্য সন্দেহভাজন বাংলাদেশ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের মাথা থেকে মুখমণ্ডল পর্যন্ত ঢাকা টুপি পরেছিল। ইন্ডিয়ান সীমান্তের অনেক ভেতরে এই হস্তান্তরের কাজটি করা হয়। দুই দেশের বাহিনীর মধ্যে উচ্চপর্যায়ের দহরম-মহরম থাকার বিষয়টি এ ঘটনার মাধ্যমে ফুটে ওঠে। টিবিএসে এ-সংক্রান্ত প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়, সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী গুম হওয়ার দুই মাস পরে মেঘালয় রাজ্যের রাজধানী শিলংয়ে সালাউদ্দিনকে পাওয়া যায়। ভারতে অবৈধভাবে ঢোকার দায়ে তাকে আটক করা হয়। ভারতীয় সে উপস্থিত ছিল। সে সময় র‍্যাবের গোয়েন্দা শাখা তামাবিল সীমান্ত দিয়ে তিন বন্দীকে ইন্ডিয়া থেকে গ্রহণ করে। সীমান্ত পার হওয়ার সময় সেখানে উর্দি পরা ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বা বিএসএফ সদস্য উপস্থিত ছিল। ওই র‍্যাব সেনা আরও জানায় যে এ রকম এক বিনিময়ের ঘটনার সময়ে দুই বন্দীকে ভারতে থেকে গ্রহণ করা হয়। পরে তাদের দুজনকেই রাস্তার পাশে খুন করেছে র‍্যাব।

আরেকবার একজন বন্দীকে ভারতের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয় এবং তাকে বাংলাদেশের ভেতরে জীবিত অবস্থায়ই আরেকটি দলের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এর বদলে র‍্যাব গোয়েন্দা শাখা বাংলাদেশের দুই বন্দীকে ভারতের কাছে হস্তান্তর করেছিল।

কমিশনের প্রতিবেদন জানায়, শেখ হাসিনার আওয়ামী শাসনামলে গুমের প্রধান হোতা হিসেবে র‍্যাব, ডিবি এবং কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইমস বা সিটিটিসিকে শনাক্ত করেছে অপহৃত ব্যক্তি, সাক্ষী এবং তাদের পরিবার-পরিজনেরা।

এ ছাড়া গুমের সাথে জড়িত ছিল সেনা গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই এবং এনএসআই নামে পরিচিত ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স।

এদিকে কমিশন নিয়ে অন্য একটি দৈনিকে প্রকাশিত আরেক যোগাযোগমাধ্যমে ঠাট্টা-মশকরা এবং ব্যঙ্গবিদ্রূপে 'হাউন আঙ্কেল' বলা হয়। 'হাউন আঙ্কেলের' 'ভাতের দোকান'ও এভাবে 'সুনাম' কামিয়েছে।

বিএনপি নেতা ইলিয়াস আজও ফেরেননি। তার শিশুসন্তানকে নিয়ে স্বজন হারানোর বেদনার কীর্তন শুনিয়েছেন খোদ শেখ হাসিনা। বিপ্লব-পরবর্তী বাংলাদেশে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, ইলিয়াসকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে নাকি সত্যিই ফোন করা হয়েছিল। এ ফোন পাওয়ার পর তাকে জানানো হয় যে একটু আগেই কক্সবাজারের সৈকতের কাছে ইলিয়াসকে হত্যা করে পাথর বেঁধে লাশ সাগরে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

জীবনানন্দ দাশের 'সব পাখি ঘরে আসে' কিন্তু সব গুম হওয়া আদম সন্তান ঘরে ফেরে না।

এখনও কুমড়ো ফুলে ফুলে
নুয়ে পড়েছে লতাটা,
সজনে ডাঁটায়
ভরে গেছে গাছটা,
আর আমি ডালের বড়ি
শুকিয়ে রেখেছি–
খোকা তুই কবে আসবি!–আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কবিতাটা

গুমের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে যারা ফিরে এসেছেন, তাদের অনেককে সন্ত্রাসবিরোধী আইন, অস্ত্র আইন, বিস্ফোরকদ্রব্য আইন, বিশেষ ক্ষমতা আইন অথবা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ বিভিন্ন আইনে করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

আদালত তাকে নিরপরাধ ঘোষণা করার পরও সালাউদ্দিনকে দেশে ফিরতে দেওয়া হয়নি।

শেখ হাসিনা ভেগে যাওয়ার ছয় দিন পর তিনি দেশে ফিরতে পারেন। উত্তরা থেকে গুম হওয়ার ছয় বছর বাদে তিনি ফিরে আসেন।

প্রতিবেদনে মাওলানা দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর মামলার সাক্ষী সুখরঞ্জন বালির ঘটনাও তুলে ধরা হয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রাঙ্গণ থেকে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে কলকাতার কারাগারে তার খোঁজ মেলে।

সালাউদ্দিন কাদের ছেলে হুম্মাম কাদের চৌধুরীর ছেলের গুম হওয়ার অভিজ্ঞতার বর্ণনাও প্রতিবেদনে দেওয়া হয়েছে। বন্দিশালায় তার কক্ষের বাইরে হিন্দিভাষী মানুষদের আলাপ তিনি শুনেছেন। তারা জানতে চাচ্ছিল হুম্মামের অবস্থা কেমন? তার কাছ থেকে কোনো তথ্য বের করা গেছে কি? এ পর্যন্ত কী ধরনের জেরা করা হয়েছে?

র‍্যাব গোয়েন্দা শাখায় মোতায়েন সেনাদের সাথে কথা বলেও কমিশন গা শিউরে ওঠার মতো অনেক তথ্য পেয়েছে। বাংলাদেশ-ইন্ডিয়ার মধ্যে বন্দিবিনিময় এবং বিনিময় হওয়া বন্দীদের কপালে কী জুটেছে, তা-ও জানা গেছে। এক র‍্যাব সেনা জানায়, ২০১১ সালে এ রকম দুটি বিনিময়ের ঘটনার সময় খবরে বলা হয়েছে, কমিশন ১ হাজার ৬৭৬টি জোরপূর্বক গুমের অভিযোগ পেয়েছে। এর মধ্যে ৭৫৮টি অভিযোগ পর্যালোচনা করেছে তারা। কমিশন এখন পর্যন্ত যে ৭৫৮ জনের অভিযোগ যাচাই-বাছাই করেছে, তার মধ্যে ৭৩ শতাংশ ভুক্তভোগী ফিরে এসেছেন। বাকি ২৭ শতাংশ, অন্তত ২০৪ জন, এখনো নিখোঁজ রয়েছেন।

কমিশন প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, গুমের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে যারা ফিরে এসেছেন, তাদের অনেককে সন্ত্রাসবিরোধী আইন, অস্ত্র আইন, বিস্ফোরকদ্রব্য আইন, বিশেষ ক্ষমতা আইন অথবা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ বিভিন্ন আইনে করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

গুমের ঘটনায় নির্দেশদাতা হিসেবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্পৃক্ততার প্রমাণ পেয়েছে কমিশন। এ ছাড়া হাসিনা প্রশাসনের বেশ কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার গুমের ঘটনায় সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসান এবং পুলিশ কর্মকর্তা মো. মনিরুল ইসলাম ও মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ। শেষোক্ত কর্মকর্তাকে নিয়ে সামাজিক নিষ্ঠুর সত্য হয়ে আছে অনেক মায়ের জীবনে।

'ঝাপসা চোখে মা তাকায়
উঠোনে, উঠোনে
যেখানে খোকার শব
শকুনিরা ব্যবচ্ছেদ করে।
এখন,
মা'র চোখে চৈত্রের রোদ
পুড়িয়ে দেয় শকুনিদের।

কিন্তু বাস্তবতা হলো 'মা'র চোখে চৈত্রের রোদ পুড়িয়ে দিতে পারেনি শকুনিদের।'

অন্যদিকে ৩৬ জুলাইয়ের (৫ আগস্ট) পর ঢাকার দেয়ালে লেখা নিচের গ্রাফিতি অনেকেরই নজরে পড়েছে:

তোমরা হয়তো যাইবা ভুলে
খুনি হাসিনার ইতিহাস
সে মায়ে রাখবো মনে
যে ছুইঁছে পোলার লাশ!

সত্যি বলতে কি, একইভাবে এখনো মনে রাখবে সে হতভাগিনী মা যিনি জানেন না তার পোলাটা আজও বেঁচে আছে নাকি খুন করে শেখ হাসিনার সিক্রেট পুলিশ পাথরে বেঁধে দেহ ফেলে দিয়েছেকোনো অতল বিল-ঝিল বা নদীতে।

গ্রাফিক্স: ইজেল

ক্ষমতার পেছনের ছায়া সৈনিক কেজিবি

আমিল বতুল

গোপন পুলিশ বা গুপ্তচর সংস্থাগুলো যুগে যুগে ক্ষমতার পেছনের ছায়া সৈনিক হিসেবে কাজ করেছে। তারা সরাসরি মানুষের জীবনে নাক গলিয়ে, ভয় দেখিয়ে শাসকদের ক্ষমতা ধরে রাখত। শাসকের গোপন হাত হিসেবে এদের তৎপরতা দুনিয়ার দেশে দেশে ছিল এবং আছে। স্তালিনের এনকেভিডি, পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কেজিবি, ইরানের সাবেক শাসক রেজা শাহ পাহলভির সাভাক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জে এডগার হুভারের পরিচালিত এফবিআই, ইহুদিবাদী ইসরায়েলের শিন বেত, রোমানিয়ার সিকিউরিটিস, শেখ মুজিবের শাসনাধীন বাংলাদেশে রক্ষীবাহিনী এবং তার কন্যা শেখ হাসিনার দেড় দশকের বেশি সময়ের টানা রাজত্বকালীন র‍্যাবএকই সংস্করণ। সব ক্ষেত্রেই এদের সবার কাজের ধরন ছিল প্রায় একই। জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতকে সামনে রেখে এরা সমাজের বুকে গভীর ক্ষত তৈরি করেছে।

গোয়েন্দা চক্র গড়ে তোলার নাম নিলেই চীনা সম্রাট চিন শি হুয়াং (খ্রিষ্টপূর্ব ২২১-২০৬) নামটি আসবে। গোটা দেশজুড়ে গুপ্তচরের বিশাল জাল গড়ে তোলেন তিনি। তার গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্যরা দেশটির সমাজে সব স্তরে গা ঢাকা দিয়ে ওত পেতে থাকত। বলা হয় এক গরিব চাষি রাজার করনীতির কঠোর সমালোচনা করলে তাকে প্রকাশ্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এমন কঠোরভাবে রাজ্য পরিচালনার কারণেই তাকে বলা হতো চীনের প্রথম সম্রাট।

গোয়েন্দা তৎপরতায় পিছিয়ে ছিল না প্রাচীন মিসরও। তৃতীয় রামসেসের (খ্রিষ্টপূর্ব ১১৫৫) উৎখাতের চেষ্টা ফাঁস হয়ে যায় গুপ্তচর তৎপরতার মধ্য দিয়েই। ফারওয়ের স্ত্রীর অন্যতম রানি তেই নিজ পুত্র পেন্তাওয়ারকে সিংহাসনে বসানোর জন্য ষড়যন্ত্র করেছিলেন। গোয়েন্দারা এ তৎপরতার কথা রামেসেসকে জানায়। ষড়যন্ত্রকারীদের কেউ কেউ আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। আর কাউকে কাউকে দেওয়া হয় প্রাণদণ্ড। প্রাচীন মিসরে পুরোহিতদের গোয়েন্দা তৎপরতায় লাগানো হতো।

এদিকে খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ দশকেব চাণক্যের অর্থশাস্ত্র গুপ্তচরবৃত্তির প্রথম আধুনিক নির্দেশিকা হয়ে ওঠে। চাণক্যের নীতি অনুযায়ী, যুদ্ধ নয় শত্রুকে ধ্বংস করার সবচেয়ে সহজ পথ হলো গোপন তথ্য। মৌর্য সাম্রাজ্যের আমলে গুপ্তচররা ব্যবসায়ী, সন্ন্যাসী কিংবা সাধারণ শ্রমিকের ছদ্মবেশে কাজ করত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে শীতল যুদ্ধের দিনগুলোতে দুনিয়াজুড়ে গোয়েন্দা তৎপরতা চালানোর ক্ষেত্রে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল কেজিবি। গোয়েন্দা সংস্থাটি নিজ দেশে তার পূর্বসূরিদের মতোই বিরোধী দমনে তৎপর ছিল।

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় বসে বলশেভিকরা। রাজতন্ত্রবাদী, সমাজতান্ত্রিক ডেমোক্র্যাট, বিদেশি শক্তি এবং আরও অনেককে নিয়ে গঠিত দুর্বল জোটের বিরুদ্ধে দেশটিতে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। শত্রু নির্মূল এবং সদ্য গঠিত দুর্বল নতুন শাসনব্যবস্থাকে রক্ষা করতে বলশেভিকরা 'চেকা' নামের গোয়েন্দা পুলিশ গঠন করে।

১৯১৮ সালে ভ্লাদিমির লেনিন ব্যর্থ হত্যা প্রচেষ্টায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। চেকা দ্রুত 'লাল সন্ত্রাস' নামের এক অভিযান শুরু করেছিল। অভিযানটির রূপ ছিল মারাত্মক হিংস্র। চেকার নেতা ফেলিক্স দেরঝিনস্কি ঘোষণা দিয়েছিলেন, সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে যে কেউ সামান্য গুজবও ছড়াবে, তাকে দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে। পাঠানো হবে নির্যাতন শিবিরে। মুখে এ কথা বললেও কার্যত প্রায় বিনা বিচারে শুরু হলো গণহারে গুলিবর্ষণ এবং ফাঁসি। কোনো স্থানে ভুল সময়ে উপস্থিত থাকার জেরেও প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে অনেককে। এভাবে নবগঠিত বিপ্লবী আদালতে প্রায় এক লাখ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল।

রাশিয়ার রাজপরিবারের বেঁচে যাওয়া সব সদস্যকেই এইসব আদালত বিভিন্ন পদ থেকে বের করে দিয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের আগামী দিনের রূপরেখা ঠিক করে ফেলা হয়েছিল। এমনকি তুলনামূলক শান্ত পরিস্থিতিতেও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কৃষ্ণ ছায়া সোভিয়েত জনগণের ওপর ঝুলে ছিল।

১৯২০-এর দশকে 'লাল সন্ত্রাস' এবং গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে। সংক্ষিপ্ত বিরতির পর আবার নির্যাতনের ভয়াল দিনগুলো ফিরে আসে। তবে এ দফায় পরিস্থিতি আরও ভয়াল হয়ে ওঠে। লেলিনের মৃত্যুর পর কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এসেছিলেন জোসেফ স্তালিন। গোটা দেশ এবং দলের ওপর তার নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য উঠেপড়ে লাগেন তিনি। ১৯২২ সালে চেকার স্থান দখল করে নেয় এনকেভিডি। দলের নীতি মানো না হয় তার মূল্য দাও–স্বৈরশাসকের এ নীতি বাস্তবায়নের প্রধান হাতিয়ার হয়েছিল এনকেভিডি।

বলশেভিক দলের দুশমনদেরই চেকার নির্যাতনের কবলে পড়তে হয়েছে। কিন্তু স্তালিন যাদের শত্রু বলে মনে করতেন, তাদেরই এনকেভিডির শিকার বনতে হয়েছে। দলের উচ্চপদস্থ নেতা,

বলশেভিক সিক্রেট পুলিশ চেকা যা পরে কেজিবি নামে পরিচিত হয়, এ গুপ্ত বাহিনির প্রতিষ্ঠাতা ফেলিক্স এডমন্ডোভিচ জেরোনেস্কি, ১৯১৯।

সরকারি কর্মকর্তা, সেনা কর্মকর্তা, ট্রটস্কির মতো সোভিয়েত প্রবীণ নেতা এবং সম্ভাব্য শত্রু অর্থাৎ স্তালিনের কাছে যারাই দুশমন বা সম্ভাব্য দুশমন হিসেব চিহ্নিত হয়েছে, তারা কেউই নিস্তার পায়নি।

স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য গুপ্ত পুলিশ নির্যাতন চালাত এবং ভুয়া আলামত ও সাক্ষ্য ব্যবহার করত। প্রকাশ্য বিচারের রায় কী হবে, তা আগেভাগেই জানা থাকত। সব মিলিয়ে গোটা সোভিয়েত ইউনিয়ন জুড়ে ত্রাসের হাঁড় কাঁপানো হাওয়া বইতে থাকে। স্তালিন এক নতুন আইন প্রণয়ন করেন। এই আইনের আওতায় সন্দেহভাজন ব্যক্তির ১২ বছর বয়সী সন্তানসহ পরিবারের সদস্যদের প্রাণদণ্ড দেওয়া যেত।

স্তালিনের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ সের্গেই কিরোভ আততায়ীর হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে। সের্গেইয়ের হত্যাকাণ্ডকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন স্তালিন। শুরু করেছিলেন তার 'মহা ছাঁটাই' অভিযান। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, এনকেভিডিকে এই অভিযান চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৮-এর মধ্যে ৪০ হাজার এনকেভিডির সদস্য অভিযান পরিচালনা করে। তারা প্রায় ১৫ লাখ সোভিয়েত নাগরিককে আটক করেছিল। এর মধ্যে অর্ধেকই নিহত হয়। ভাগ্যক্রমে যারা জানে বেঁচে যায়, তাদের পাঠানো হয় গুলাগ নামে পরিচিত শ্রমশিবিরে। গোটা সোভিয়েত ইউনিয়নে এ রকম অনেক গুলাগ ছিল।

১০৩০ দশকের সন্ত্রাসের ঠেলায় সোভিয়েত সামরিক বাহিনী ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পরিণামে ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের নাজি আগ্রাসন ঠেকানোর প্রস্তুতি এ বাহিনীর ছিল না। এনকেভিডি তখন কেবল জার্মান ঠেকানোর যুদ্ধই করেনি। বরং মস্কোর লাল ফৌজ ছেড়ে ভেগে যাওয়ার প্রবণতার বিরুদ্ধেও কড়াভাবেই নেমেছিল।

প্রচারণা চালিয়েও কাঙ্ক্ষিত ফল না পেয়ে এবারে বাঁকা আঙুলে ঘি ওঠানোর পথ ধরল এনকেভিডি। লাল ফৌজ পলাতক সেনাদের পাকড়াও করা শুরু করেছিল। বিশেষ করে ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্রের আশেপাশে এ তৎপরতা খুবই জোরদার করা হয়েছিল। সন্দেহভাজন পলাতকদের সংক্ষিপ্ত বিচার করে হত্যা করা হতো বা বন্দিশিবিরে পাঠানো হতো। শাস্তিস্বরূপ যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হতো। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে এনকেভিডির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লাল ফৌজের সদস্যদের মধ্য থেকে সাড়ে ছয় লাখের বেশি দলত্যাগী সদস্যকে আটক করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ হয় এবং ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে স্তালিন ধরাধাম ত্যাগ করেন। এনকেভিডির নাম বদলে কেজিবি রাখা হয়েছিল। তারপরও সোভিয়েত নাগরিকদের ওপর অনেক নিয়ন্ত্রণ ছিল কেজিবির হাতে। ১৯৬০-এর দশকে এসে প্রথমবারের মতো সোভিয়েত নাগরিকদের সরকার বিরোধিতা করা সম্ভব হতো। নিকিতা ক্রুশ্চেভ ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে দেওয়া বিখ্যাত ভাষণে স্তালিনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন। স্তালিনের ব্যক্তিত্ব ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সমালোচনার ছুরি চালাতে দ্বিধা করেননি ক্রুশ্চেভ। কিন্তু তার মানে এই নয় সোভিয়েত ইউনিয়নে মুক্তির হাওয়া বইতে শুরু করে। তখনো জোরদার বিরোধিতা করার পরিণাম খড়গের জন্য তৈরি থাকতে হতো। তবে এ জন্য ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে হতো না।

লেখক ইউলি ড্যানিয়েল এবং আন্দ্রেই সিন্যাভস্কির লেখনি বন্ধ

করে দিতে চেয়েছিল কেজিবি। বিদ্বেষপ্রসূত কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নকে অপমান করার অভিযোগ আনা হয়। তাদের গুলাগের শ্রমশিবিরে পাঠানো হয়েছিল। অবশ্য তাদের গল্পগুলো পশ্চিমে চোরাপথে পাচার করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল এবং ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল।

বরিস পাস্তারনাকের বিখ্যাত উপন্যাস ডক্টর জিভাগো বিদেশে প্রথম প্রকাশের কয়েক দশক পরের কাহিনি। ওই বই রাশিয়ানদের পড়তে হলে খুঁজতে হতো কেবল কালোবাজারে। আইন ভেঙে এ বই পড়ার গুনাহগারি হিসেবে চাকরিচ্যুত হতে পারত বেয়াড়া পাঠক। কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় ঠাঁই হারাতে পারত। কিংবা তার স্বাধীনতা খর্বও হতে পারত। সোভিয়েত লেখক সংঘ থেকে পাস্তারনাককে বের করে দিয়েছিল কেজিবি। সাহিত্য নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করার জন্য বরিসের ওপর চাপ সৃষ্টি করে কেজিবি। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে পাস্তারনাকের মৃত্যুর পর তার প্রেমিকা ওলেগা আইভিনস্কাইকে গুলাগে পাঠানো হয়েছিল।

সমালোচকদের মুখবন্ধ করে দেওয়ার আরও অনেক পথ খোলা ছিল কেজিবির হাতে। লেখক এবং সক্রিয়বাদী আলেকজান্দার সলঝেনিতসিনকে প্রথমে গ্রেপ্তার করা হয়। কারাগারে পোরা হয়। সবশেষ তার নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে বিদেশে নির্বাসনে যেতে বাধ্যও করা হয়েছিল। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পদার্থবিদ আন্দ্রেই সাখারভ সমালোচনার তির ছুড়তে শুরু করলে এবং মানবাধিকারের পক্ষে কথা বলা শুরু করলে তার ওপর দুর্যোগের পাহাড় ভেঙে পড়ে। অপহরণ করে হাসপাতালে নিয়ে আটক রাখে। বিছানার সাথে এ পদার্থবিদকে বেঁধে রাখা হতো। ওষুধ গেলানো চলত। নিষ্ঠুরভাবে বল প্রয়োগ করে খাবার গলায় ঢোকানো হতো। এ ছাড়া বাড়তি হিসেবে অন্যান্য নির্যাতনও চলত তার ওপর। আটক করার পরও যদি সোভিয়েত সমালোচনা থেকে কেউ বিরত না হতো, তার জন্য ভিন্ন দাওয়াই দিত কেজিবি। তাকে তখন পাগলাগারদে কথিত চিকিৎসার জন্য পাঠানোর নাটকও করেছিল।

১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে কেজিবির এক অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ভণ্ডুল করে দেয় বরিস ইয়েলেতসিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার জনগণ। কেজিবির স্থপতি কুখ্যাত ফেলিক্স দেরঝনিস্কির মূর্তিটি মস্কোর লুবিয়ানকা সদর দপ্তরের সরিয়ে ফেলা হয়। তবে তা ধ্বংস করা হয়নি। এখনো একটি জাদুঘরে রয়েছে ওটি। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর কেবিজির জায়গায় স্থান করে নেয় এফএসবি (ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস)। সমালোচকদের এফএসবি স্তালিন শাসনামলের মতো সাইবেরিয়ার শ্রমশিবিরে পাঠায় না ঠিকই, তারপরও বিরোধীমত দমন করার সোভিয়েত জমানার কৌশল ব্যবহার করতে দ্বিধা করে না এখনও।

গ্রাফিক্স: ইজেল

মিয়ানমারের গোপন পুলিশ ও 'আয়নাঘর'

আতিক উল্লাহ

প্রতিটি স্বৈরশাসক বিশ্বাস করে যে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তাদের একটি গোপন পুলিশ বাহিনী প্রয়োজন। আর সেটি যত বেশি নৃশংস, তত বেশি কার্যকর হবে। নাৎসি জার্মানির 'গেস্টাপো' বা গেহেইমে স্ট্যাটসপোলিজেই ছিল তাদের সেই 'দ্য সিক্রেট স্টেট পুলিশ'। ইরানের শাহ বংশের শাসকেরা সাভাকের ওপর নির্ভর করতেন, যারা দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং গোয়েন্দা পরিষেবার কাজটি করত। রোমানিয়ার স্বৈরশাসক নিকোলাই চশেস্কুর ছিল 'সিকিউরিতেত', যা ছিল রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগ। আর মিয়ানমারের জেনারেলদের আছে সামরিক গোয়েন্দা পরিষেবা, বছরের পর বছর ধরে এর নাম পরিবর্তন হলেও সর্বদা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একটি প্রধান স্তম্ভ হিসেবে ভূমিকা রেখে গেছে সংস্থাটি।

গোপনীয় স্বভাব এবং প্রভাবের কারণেই দেশটির সামরিক গোয়েন্দারা অন্তত দুবার একটি দেশের মধ্যে আরেকটি রাষ্ট্রযন্ত্রের মতো কাজ করেছে; যা শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্ট করেছে এবং এসব কারণেই গোয়েন্দা সংস্থার কিছু নেতাকে দীর্ঘ কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, যাতে বাহিনী শুধরায়। অন্ধ আনুগত্য যাতে ঠিক থাকে, তা নিশ্চিত করতে মিয়ানমারের বর্তমান স্বৈরশাসক সিনিয়র জেনারেল মিন অং হ্লাইং তার শীর্ষ গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের পূর্বসূরিদের চেয়ে আরও বেশি কাছাকাছি রাখছেন। বর্তমানে এই গোপন গোয়েন্দা বাহিনীকে বলা হয় 'অফিস অব চিফ অফ মিলিটারি সিকিউরিটি অ্যাফেয়ার্স' (ওসিএমএসএ)। জান্তাপ্রধানের মন্ত্রিসভা বৈঠক থেকে শুরু করে বিদেশি কূটনীতিকদের সাথে বৈঠক এমনকি বিদেশ সফরেও বাহিনীর লোকজন তার সাথে থাকেন।

মিয়ানমারে ২০২১ সালের অভ্যুত্থানের পর থেকে এই বাহিনীর দায়িত্বে আছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইয়ে উইন ওও। তাকে জান্তাপ্রধানের সাথে বিভিন্ন সফরে দেখা গেছে। জান্তাবিরোধীদের খুঁজে বের করা ও তাদের দমনে তাকে দায়ী করা হয়। তিনি সেনাবাহিনীর জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রও পরিচালনা করেন, যেখানে বন্দীদের নির্যাতন করা হয়। যার মধ্যে সাধারণত বৈদ্যুতিক শক, যৌনাঙ্গ পোড়ানো, ফুটন্ত তরল ঢালা বা ভুক্তভোগীদের মুখে রাসায়নিক দ্রবণ নিক্ষেপের মতো অত্যাচার করা হয়। এমনকি আটককৃতরা নারী হলে তাদের ধর্ষণও করা হয়। ইন্টারনেট এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর সুবাদে এখন এই ধরনের তথ্য বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। তবে এসব পদ্ধতি নতুন কিছু নয়, মিয়ানমারের সাবেক সামরিক গোয়েন্দারা একই কাজ করে আসছে অনেত আগে থেকেই।

মূলত এর শুরু জেনারেল নে উইনের সময় থেকে, যিনি ১৯৬২ সালে ক্ষমতা দখল করে এশিয়ার সবচেয়ে নির্মম এবং দক্ষ গোপন পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। যাকে বলা হতো মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস (এমআইএস)। সবাই এ বাহিনিকে ভয় পেত। এই বাহিনীর তথ্যদাতারা সব জায়গায় বিরাজমান ছিল, এমনকি ভিন্নমতাবলম্বীদের মাঝেও তাদের চর থাকতো। নে উইন জাপানের টোকিওতে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের লেফটেন্যান্ট কর্নেল জেমস ম্যাক অ্যান্ড্রু ২০০৭ সালে তার এক গবেষণায় বলেন, গেরিলা কৌশল, গোপন কার্যকলাপ এবং নেতৃত্ববিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ নে উইনকে স্বৈরশাসক হওয়ার পথে নিয়ে যায়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে তিনি জাপানের সামরিক পুলিশ এবং কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স সংস্থা 'কেম্পেইতাই' থেকে প্রশিক্ষিত ছিলেন। আর এই বাহিনীর প্রশিক্ষণ পেতেও প্রয়োজন হয় বিশেষ যোগ্যতার। তার কার্যকাল থেকেই স্পষ্ট হয় কর্তৃত্ববাদী শাসন বজায় রাখতে হলে এমন গোপন গোয়েন্দা বাহিনী বা পুলিশের বিশেষ প্রয়োজন।

বহু বছর ধরে নে উইনের বিশ্বস্ত গোয়েন্দাপ্রধান ছিলেন তার অধস্তন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল টিন। এম টি ওও নামে পরিচিতি পাওয়া এই সেনা কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা থেকে। মিয়ানমারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ আইনবিদ লে মংও প্রশিক্ষণ নিয়েছেন একই সংস্থা থেকে। যুক্তরাষ্ট্র তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কারণ হলো, তখন বার্মার বিদ্রোহী কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল সামরিক বাহিনী। কিন্তু ১৯৬১ সালে চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মির সাথে মিলে

গুপ্ত বাহিনীর কর্মকর্তা কর্নেল কাউ থিন (বামে), কর্নেল থিন সেউ (মাঝে) এবং তৎকালীন সামরিক জান্তা সরকারের দ্বিতীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি কর্নেল কাউ উইন, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭।

যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানি, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী রাজনৈতিক নির্বাসিতদের ওপরও সংস্থাটি নজরদারি চালাত বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। নে উইনের বিরোধীরা নিজেদের মধ্যে গুপ্তচর আছে বলে শঙ্কিত থাকত বেশিরভাগ সময়।

মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত ন্যাশনালিস্ট চায়নিজ কুয়োমিনতাং ফোর্সের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান শুরু করলে প্রশিক্ষণ দেওয়া বন্ধ করে দেয় দেশটি।

নে উইন ছিলেন এক প্রবল কর্তৃত্ববাদী, স্বৈরশাসক। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে বিচারের মাধ্যমে ফাঁসিতে ঝোলানো থেকে শুরু করে নে উইনের রাজনৈতিক বিরোধীদের সাথে যোগাযোগ থাকার সন্দেহেও অনেক মানুষকে গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। নিজস্ব কারাগার এবং নির্যাতন কেন্দ্রও ছিল এমআইএসের, যার নাম ছিল ইয়া কি আইং। বাংলাদেশে সরকারি সংস্থার আয়নাঘরের যে বর্ণনা পাওয়া গেছে, তার সাথে এর মিল রয়েছে। অনেক রাজনৈতিক বন্দীকে সেখানে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। সারা দেশেই এমআইএস পরিচালিত ছোট কারাগার ছিল। সাধারণ নাগরিকদের পাশাপাশি উদারপন্থী সেনা কর্মকর্তাদের ওপরও দৃষ্টি থাকত এই বাহিনীর।

যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানি, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী রাজনৈতিক নির্বাসিতদের ওপরও সংস্থাটি নজরদারি চালাত বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। নে উইনের বিরোধীরা নিজেদের মধ্যে গুপ্তচর আছে বলে শঙ্কিত থাকত বেশিরভাগ সময়।

১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে এমআইএস আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সেই সময়ে ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউতে বাহিনীটির বিষয়ে রডনি টাস্কার লিখেন, জেনারেল টিন ও তার এমআইএস বাহিনিই বার্মিজ নেতৃত্বের মূল ভিত্তি।

কিন্তু ১৯৮৩ সালের মে মাসে হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিতভাবে ঘোষণা করা হয় যে টিন ওও-কে এবং তার সহযোগী কর্নেল বো নিকে 'পদত্যাগ করানো হয়েছে'। তাদের স্ত্রীরা দুর্নীতিগ্রস্ত, এমন অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং দুজনকেই কারাগারে পাঠানো হয়। এ সময়ে পুরো এমআইএস বাহিনকে সংস্কারের কথা আরো শক্তিশালী ভাবে গড়ে তোলা হয়। তারা প্রায় একটি রাষ্ট্রের ভেতরে আরেকটি 'রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, এবং নে উইনের বাছাই করা লোকজনদের হুমকির মুখে ফেলে দেয়।

১৯৮৪ সালে জেনারেল থিন ন্যুন্টকে প্রধান করে গোয়েন্দা নতুন বাহিনী গড়ে তোলা হয়, এর নামকরণ হয় ডিরেক্টরেট অব ডিফেন্স সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স (ডিডিএসআই)। দলটি দ্রুতই আগের বাহিনীর মতো দক্ষতা দেখাতে শুরু করে।

তবে থিন ন্যুন্ট মিয়ানমারের সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর পুনর্গঠন শুরু করার চার বছরের কম সময়ের মধ্যেই দেশজুড়ে অস্থিরতা শুরু হয়। দেশব্যাপী লাখ লাখ মানুষ নে উইনের শাসনের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র ফিরে পাওয়ার দাবিতে রাস্তায় নেমে পড়ে। কিন্তু নে উইনের সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে দেশজুড়ে হত্যাযজ্ঞ চালায় থিন ন্যুন্ট-এর বাহিনী। হাজার হাজার মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

বিদ্রোহ দমনের পর গোয়েন্দা বাহিনী ডিডিএসআইয়ের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করা হয়। ১৯৯১ সালের মধ্যে আরও নতুন নয়টি ইউনিট চালু করা হয় ডিডিএসআইয়ের। এ সময় এ বাহিনির অধীনে ছিল ১৯টি আটক কেন্দ্র। যার সাতটিই ছিল ইয়াঙ্গুনে এবং এর মধ্যে কুখ্যাত ইয়া কিং আইং এখনো চালু আছে।

১৯৯৮ সালের পর সামরিক বাহিনীর ওপর নে উইনের প্রভাব কমতে শুরু করে এবং ২০০২ সালের ডিসেম্বরে গৃহবন্দী অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মেয়েসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের দুর্নীতির অভিযোগে তাকে গৃহবন্দী করা হয়েছিল।

নে উইনের ক্ষমতা হারানোর পরের বছর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় আসেন ডিডিএসআইয়ের প্রধান থিন ন্যুন্ট। কিন্তু ২০০৪ সালে তাকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা হয় এবং তাকেসহ দেশজুড়ে ৩০০ জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তা এবং আরো প্রায় ৩৫০০ গোয়েন্দা সদস্যকে আটক করা হয়। অনেকে মনে করেন, নে উইন এবং তার পরিবারের ওপর পদক্ষেপ নেওয়ার কারণ ছিল আসলে থিন ন্যুন্টের প্রভাবকেই সীমাবদ্ধ করা।

নে উইন এতটাই কোনঠাসা হয়ে ছিলেন যে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কেবল পরিবারের কয়েক সদস্য এবং ২০ জন সাধারণ পোশাকধারী সামরিক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়ও দাহ করা হয়নি।

আর থিন ন্যুন্টকে উৎখাতের কারণ হিসেবে বলা হয়, তিনিও জেনারেল টিনের মতোই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। দেশের মধ্যেই ভিন্ন এক বলয় তৈরি করে নিয়ে ছিলেন তিনি। তার বলয়ের একজন না হলে উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তারা সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতেন। আর এ থেকেই নতুন স্বৈরশাসক সিনিয়র জেনারেল থান শির বিরাগভাজন হয়ে উঠেন থিন ন্যুন্ট।

থিন ন্যুন্টকে অপসারণের পরপরই ডিডিএসআই বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সম্পূর্ণ নতুন বাহিনী প্রতিষ্ঠা করা হয়; যার নাম রাখা হয় ওসিএমএসএ, যা এখনো বর্তমান। সংস্থাটিকে এখন পুরোদস্তুও সামরিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে।

২০১১-২০২১ সাল পর্যন্ত নবগঠিত ওসিএমএসএ নির্বিঘ্নেই কাজ চালিয়ে গেছে। সংস্থাটি স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষের ওপর নজরদারি চালিয়েছে। কিন্তু ২০২১ সালে অভ্যুত্থানের সময় থেকে ওসিএমএসএ লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইয়ে উইন ও ভয়ংকর নির্মমতা চালাতে শুরু কওে, মানবাধিকার সংগঠন অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যাসোসিয়েশন ফর পলিটিক্যাল প্রিজনারের (এএপিপি) তথ্য অনুযায়ী, অভ্যুত্থানের পর থেকে ৩ হাজার ১৯৪ জনকে হত্যা করা হয়েছে। আটক করা হয়েছে ১৭ হাজার ৭৫ জনকে এবং তাদের মধ্যে আদালতে সাজা হয়েছে ৫ হাজার ২৭৪ জনের। ১০৮ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে এবং ১৫০ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার প্রক্রিয়া চলমান।

১৯৮৮ সালের অভ্যুত্থানের আগপর্যন্ত মিয়ানমার গোয়েন্দা বাহিনীর কার্যক্রম মোটাদাগে দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিদেশে খুব সামান্য কিছু অপারেশন পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু আশির দশকে বিভিন্ন ঘটনা এবং বিশেষ করে গণতন্ত্রকামী অনেক কর্মী থাইল্যান্ডে পালিয়ে আসার পর সংস্থাটি বিদেশে কার্যক্রম বাড়ায়। থিন ন্যুন্টের ডান হাত নামে খ্যাত কর্নেল থেইন শিকে ব্যাংককে পাঠানো হয়, সেখানে থাকা মিয়ানমারের জান্তাবিরোধীদের হত্যার উদ্দেশ্যে। এই সেনা কর্মকর্তা থাইল্যান্ডে তার বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন। গোয়েন্দা, কূটনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং কিছু গণমাধ্যমের সাথেও তার সখ্য তৈরি হয়। সফল কার্যক্রম শেষে মিয়ানমার ফিরে এলে শীর্ষ কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করেন থিন ন্যুন্ট।

বর্তমানে বিদেশে ওসিএমএসএ আরও বেশি সক্রিয় বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন মানবাধিকারকর্মী, সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদরা তাদের নজরদারিতে রয়েছেন বলে মনে করা হয়। অবাক করা বিষয় হলো, গণতন্ত্রকামী অনেক মানুষও এই দলের হয়ে গুপ্তচরের কাজ করা প্রমাণ পাওয়া গেছে।

গণমাধ্যমের তথ্যমতে, মিয়ানমারের সাবেক কর্মকর্তারা এখনো তাদেও আনুগত্য বজায় রেখেছে। এমনকি যারা ২০০৪ সালের ঘটনায় আটক হয়েছেন বা দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে, তারা অনেকেই পরে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। অনেককে বড় বড় পদে বসানো হয়েছে।

সিঙ্গাপুর ও ইসরায়েলের সংস্থাগুলো থেকে নতুন এবং অত্যাধুনিক সব ইলেকট্রনিক নজরদারি সরঞ্জাম কিনেছে ওসিএমএসএ। সামরিক বাহিনীর সরকারের নিপীড়নকারী এই সংস্থাটি অতীতের তুলনায় দেশে ও বিদেশে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। ফলে মিয়ানমারে অব্যাহত বিদ্রোহ, যুদ্ধ চলমান থাকলেও সামরিক সরকারের ঐক্যে এখনও কোনো ফাটল ধরেনি। এখনও গুপ্ত বাহিনি তাদেও নিপীড়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। ●

সূত্র: দি ইরাওয়দ্দি

লেফটেন্যান্ট জেনারেল ই উইন ওও, মার্চ ২০২১।

সিক্রেট পুলিশ যেভাবে আমার শৈশব ট্র্যাক করেছে

পূর্ব ইউরোপের যেকোনো জায়গায় সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়াই করা বিপজ্জনক। রোমানিয়ার ছোট্ট একটি গ্রামের কোনো বাসিন্দার জন্য এটি আরও বেশি সর্বনাশা। শুধু ব্যক্তির জন্য নয়; পরিবারের জন্যও বিপর্যয়কর। বিশেষ করে যখন সিক্রেট পুলিশ তাদের প্রতিটি কথা গোপনে রেকর্ড করে রাখে। এমনই এক বিপর্যয় নেমে এসেছিল কারমেন বুগ্যানের পরিবারে। সিক্রেট পুলিশ গোপনে তার শৈশব রেকর্ড করে রেখেছিল, যার একটি প্রতিলিপি খুঁজে পেয়েছেন তিনি। তার মুখেই শোনা যাক সেই ভীতিকর গল্পটা।
বিবিসি থেকে অনুবাদ করেছেন ***সালেহ ফুয়াদ****।*

ভাইয়ের জন্মের পর ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাবাকে জীবনের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্তটি নিতে হয়: নিজেদের গোপন টাইপরাইটারে কমিউনিস্টবিরোধী ইশতেহার লিখে তা রোমানিয়ায় বিলি করবেন, নাকি নিকোলাই চশেস্কুর নাগাল পেতে কাউকে কিছু না জানিয়ে একাই বুখারেস্টে যাবেন?

ত্রিশ বছর ধরে পিতার নেওয়া ওই সিদ্ধান্তের উত্তরাধিকার বয়ে চলেছি আমরা। একই সঙ্গে আবিষ্কার করেছি রোমানিয়ার সিক্রেট পুলিশ 'সিকিউরিতেত' লিখিত আমাদের জীবনের একান্ত ব্যক্তিগত ও ভয়ংকর গল্প।

রোমানিয়ায় তখন খাদ্যসংকট, ঘন ঘন বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন এবং যেকোনো রকমের ভিন্নমতের প্রতি হিংস্র প্রতিহিংসা দেখানোর সময় চলছে। প্রতিদিন মার্কিন বেতারকেন্দ্র ভয়েস অব আমেরিকা এবং রেডিও ফ্রি ইউরোপ শুনে আমাদের ঘুম ভাঙে, আবার তা শুনতে শুনতে আমরা ঘুমাতে যাই। বেতারের কণ্ঠ আমাদের মেরুদণ্ডে শিহরণ জাগিয়ে রান্নাঘরের শব্দের সঙ্গে মিশে যায়। আমার পিতার মনে তারা এই বলে আশা জাগায়, মানুষ নিজেদের জন্য দাঁড়ালেই কেবল জীবন আরেকটু ভালো হতে পারে।

সিকিউরিতেত আমার মা-বাবাকে ভালো করে জানত। ১৯৬১ সালের গোড়ার দিকে একটি বারে বাবা ও তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু পেট্রিকা আরও কয়েকজনকে নিয়ে উচ্চ করহার এবং খামার সংগ্রহের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান। তারা পশ্চিম রোমানিয়ার আরাদে একটি অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট হাইজ্যাক করে দেশের বাইরে উড়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন।

পেট্রিকা ছিলেন একজন সাবেক বিমানবাহিনীর কর্মকর্তা। অবসর জীবনে তিনিও বাবার মতোই রেডিও মেরামতের কাজ করতেন। কিন্তু তাদেরই এক বন্ধু ছিল সিকিউরিতেতের ইনফর্মার। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। তাই বিমানের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার আগেই সবাই ধরা পড়েন। অবৈধ উপায়ে দেশত্যাগের চেষ্টা এবং জনশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সবাইকে আট বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

বাবার বয়স যখন বিশের কোঠায়, তখন তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেন জিলাভা, দেভা এবং ব্রেইলা লেবার ক্যাম্পের ভয়ানক কারাগারে। সেখানে তিনি কিছু রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীর সাক্ষাৎ পান, যারা ছিল নানাভাবে নির্যাতিত।

১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে একটি সাধারণ ক্ষমা ঘোষিত হয়। এতে বাবা ও তার বন্ধুরা মুক্তি পান। কিন্তু সিকিউরিতেত বাবার প্রতিটি মুহূর্তকে অনুসরণ করতে থাকে। যেকোনো উপায়ে তাকে অপদস্থ করতে এবং কারাগারে ফেরত পাঠাতে চেষ্টা অব্যাহত রাখে। এই দমবদ্ধ ও ভীতিকর পরিস্থিতিতে ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাবা একটি কম্পাস, দুরবিন, অ্যান্টিবায়োটিক, কিছু ক্যাফেইনের শিশি আর সালামি রোল কিনে নিয়ে আসেন।

বাবা আর পেট্রিকা তীব্র তুষারঝড়ের ভেতর পালানোর পরিকল্পনা করেন। পুলিশের

সঙ্গে লুকোচুরি খেলে, খড়ের আড়ালে লুকিয়ে শেষ পর্যন্ত তারা বুলগেরিয়া-তুর্কি সীমান্তে পৌঁছেন।

২ মার্চ ভোর সাড়ে সাতটায় ক্ষুধায় মৃতপ্রায়, দুর্বল, ঠান্ডায় জমে যাওয়া অবস্থায় তারা একটি পাহাড়ের ঢাল ধরে গড়িয়ে নেমে, নিচের দুই মিটার উঁচু কাঁটাতারের বেড়া লাফিয়ে পার হয়ে তুরস্কের সীমায় প্রবেশ করেন। সীমান্তপ্রহরীরা নোম্যান্স ল্যান্ডেই তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। স্বাধীনতা থেকে মাত্র চার শ মিটার দূর থেকে পাকড়াও করে তাদের আবার রোমানিয়ায় ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাবাকে দণ্ডবিধির ২৬৭ ধারায় 'প্রতারণাপূর্ণ উপায়ে সীমানা পারাপারে'র অভিযোগে আইয়ুদের সবচেয়ে কঠোরতম কারাগারে ১১ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

সাজার অংশ হিসেবে তাকে আলবা ইউলিয়া কারাগারের বিশেষ শাখায় পাঁচ মাস দিনরাতে ৪৫ কেজি ওজনের শেকল পরিয়ে নির্জন কারাবাস দেওয়া হয়। কারাগারের নথি বলছে, তাকে ওখানে স্থানান্তর করা হয়েছিল একটি বিচারিক বিষয়ের জন্য। এক অর্থে তথ্যটা সঠিক; বাবাকে ওখানে নির্যাতন করা হয় চুরির সহযোগিতার জন্য। চুরির ঘটনাটি ঘটে বাবার রেডিও মেরামতের দোকানে। তখন তিনি বুলগেরিয়ার পথে বেরিয়ে পড়েছেন। বাবার মুখে সেই নির্যাতনের কথা শুনলে পশম খাড়া হয়ে যায়। তাকে দুই দিনে একবার খাবার দেওয়া হতো। পুরো সময়জুড়ে মাত্র তিনবার

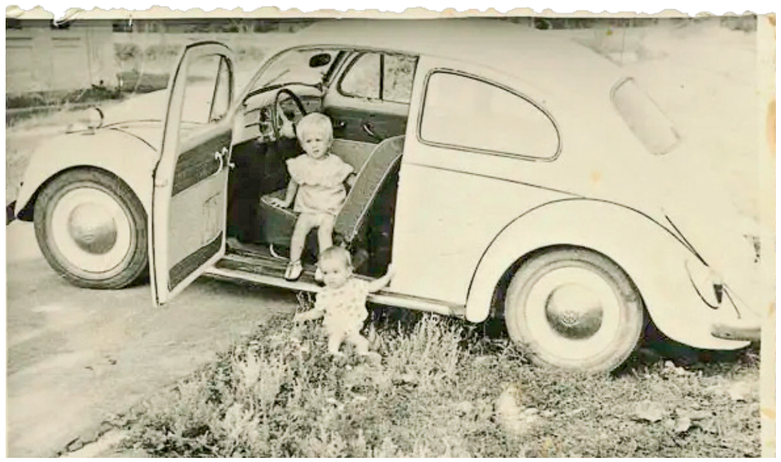

তাকে পরিষ্কার হতে দেওয়া হয়।

তবে বাবার ভাষ্যমতে, সেখানে একজন দেবদূত তার দেখাশোনা করেছেন। তাকে আবার আইয়ুদে স্থানান্তর করা হয়। দণ্ডবিধি পরিবর্তনের ফলে অপ্রত্যাশিতভাবে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

বাবা এখন স্বাভাবিক জীবনযাপনের চেষ্টা করছেন। বিয়ে করেছেন। সন্তান হয়েছে। জীবন একেবারে মন্দ না। কৃষ্ণসাগরে আমরা ছুটি কাটাতে গিয়েছি। পূর্ব রোমানিয়ার গালাটির কাছে আমাদের গ্রাম ড্রাগনেস্টিতে একটি সুন্দর বাড়ি বানিয়েছি।

কিন্তু আড়াল থেকে সিকিউরিতেত তাকে সহ্যেও প্রায় শেষ সীমায় ঠেলে দেয়। গোপনে তাকে অনুসরণ করতে থাকে। তার ওপর গুপ্তচরবৃত্তি চালাতে থাকে। আমার মা, মিওরাকে শিক্ষকতা পেশা থেকে বের করে দেওয়া হয় শুধু এই কারণে, তিনি একজন 'রাজনৈতিক আন্দোলনকারী'কে বিয়ে করেছেন। স্ত্রী হিসেবে মা তরুণ প্রজন্মের মনকে কলুষিত করে ফেলবেন এই ছিল অজুহাত। তাকে চাকরি অথবা স্বামী যেকোনো একটি বেছে নিতে বলা হয়। মা স্বামীকেই বেছে নেন। মা এবং বাবা দুজনই মুদিদোকানে কাজ করা শুরু করেন। অনেক আগে থেকেই মা দোকান চালাচ্ছিলেন। বাবাকে তার রেডিও মেরামতের দোকানে বই রাখতে নিষিধ করা হয়েছিল। মুদিদোকানেও মা তা-ই করলেন। মা-বাবা অনেক যন্ত্রণা সহ্য করেছেন, কঠোর পরিশ্রম করেছেন।

১৯৮১ সালের দিকে অত বেশি মুদিদোকান ছিল না। কারখানার ক্ষুধার্ত শ্রমিকেরা চিৎকার করে বলে, 'লাঞ্চের জন্য ব্যাগে কী রাখব?' প্রায়ই সন্ধ্যার রুটি কাড়াকাড়ির মাধ্যমে শেষ হয়। সেদিনের মতো দরজা বন্ধ হওয়ার সময় দোকানের পেছনে বাবার আক্রোশ মিশে যায় রেডিও ফ্রি ইউরোপের শব্দের সাথে। একদিন মাকে বাবা বলেন, 'শুধু নিশ্বাস নিয়ে এবং কিছুই না করে আমি জীবন কাটিয়ে দিতে চাই না।'

তারা দুইটা টাইপরাইটার কিনলেন। একটা পুলিশের কাছে নিবন্ধন করেননি। অভাব ও মানবাধিকার লঙ্ঘন ইস্যুতে কমিউনিস্টবিরোধী প্রচারপত্র তৈরি শুরু করেন। রাতের বেলা যখন আমি ও আমার বোন ঘুমিয়ে, তারা তখন সারা দেশে এসব প্রচারের জন্য গাড়ি চালিয়ে মানুষের লেটারবক্সে ভরে রেখে আসেন। চিঠি এবং নিবন্ধিত টাইপরাইটারের প্রিন্টে মিল আছে কি না, যাচাই করতে পুলিশ বাড়িতে আসতে থাকে।

আমার নবজাতক ভাই ক্যাটালিনকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়ার প্রায় এক মাস পর ১৯৮৩ সালের ১০ মার্চ বাবা বুখারেস্টের রাস্তায় নেমে পড়লেন। আমাদের লাল ডেসিয়া কারের ওপর মানবাধিকারের দাবিতে প্ল্যাকার্ড লাগিয়ে দিলেন। প্ল্যাকার্ডে আরও লিখলেন, চশেস্কু একজন জালিম, তার বিচার হওয়া জরুরি। দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য হর্ন বাজিয়ে জানালা দিয়ে লিফলেট ছুড়তে ছুড়তে একেবারে সিটি সেন্টারের দিকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যান।

মাকে এ ব্যাপারে বাবা কিছুই বলে যাননি। মা ক্যাটালিনের সঙ্গে হাসপাতালে ছিলেন। দীর্ঘদিন বিনা চিকিৎসার কারণে ফুসফুসের সংক্রমণে প্রায় মারা যাচ্ছিলেন। আমার বোন লরেদানা ছিল দূরের জিমন্যাস্টিক স্কুলে। আর বারো বছরের আমি ছিলাম বাড়িতে, দাদির সঙ্গে। এই ঘটনা ছিল আমাদের জন্য নরকের সূচনা।

বাবার প্রতিবাদ তাকে আবার আইয়ুদে ঠেলে দেয়। সমাজতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযোগে দণ্ডবিধির ১৬৬-এর ২ ধারায় ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয় তাকে। মা, বোন, ভাই ও আমাকে রাখা হয় কঠোর নজরদারিতে। বার্ষিক কারাগার পরিদর্শনের কারণে সারা দেশ ভ্রমণে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। চিঠি পাঠালেও সব সময় তা গ্রহণ করা হতো না। পাঠানো খাবারের প্যাকেট ফেরত আসত; কারণ, 'বন্দী যথাযথ আচরণ করেননি'। পচা ফ্রাইড চিকেন, নরম আপেল, আলসারের ওষুধ সেই ভাঙা বাক্সে ফেরত আসত, যেখানে কয়েক মাস আগে আমরা রেখে এসেছিলাম বাবা সেগুলো পাবেন আশা করে।

সিকিউরিতেতের কাছে আমাদের বাড়ির আলাদা চাবি ছিল। তাদের পক্ষ থেকে নির্দেশনা ছিল রান্নাঘরে পর্দা না টানানোর। এতে আমাদের পর্যবেক্ষণ করা তাদের জন্য সহজ হতো। পরে আমরা জেনেছি, বাবার অনেকগুলো সাংকেতিক নাম তাদের কাছে ছিল, যেমন অ্যাম্ব্রোনিক, বুটনারু, কাজুল কোকর, বারবু। মায়ের সাংকেতিক নাম ছিল বেলা এবং বারবু। বাবার প্রতি আমার অনুভূতির খবর রাখার জন্য সিকিউরিতেতের হয়ে কাজ করা স্কুলে আমার এক বান্ধবীর নাম ছিল কর্নেলিয়া।

১৯৮৫ সালে মাকে তালাক দিতে বাধ্য করা হয়। ১৯৮৭ সাল নাগাদ স্কুলের শিশুদের সঙ্গে আমি নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলাম। স্কুলে একজন শিক্ষক আমাকে এবং আমার বোনকে 'অপরাধীর সন্তান' বলে সম্বোধন করেছিলেন।

১৯৮৮ সালে চশেস্কু নিজের জন্মদিনে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। মা ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, ইতিহাস তাকে তার করুণার জন্য মনে রাখবে। কোনো দিন ভাবিনি মায়ের এই কথাগুলোই ত্রিশ বছর পর সরকারি আর্কাইভে প্রতিলিপি আকারে পাব!

১৯৮৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি বাবা যখন রাতের বেলা হেঁটে বাড়িতে আসেন, তখন বাড়িতে থাকা গোপন মাইক্রোফোনগুলো রেকর্ড করে 'শিশুদের কাছ থেকে আসা আনন্দমুখর পরিবেশ'। আমার বাবা 'প্রতিটি ঘর ঘুরে দেখেন'। 'শেভার চেয়েছেন' এবং 'রেডিওর খোঁজ নিয়েছেন'। তারা এ কথাও নোট করে, বাবা কাতালিনকে বাহুতে জড়িয়ে নিয়েছেন। সেই প্রথম রাতের নথি বলছে, 'পরিবারের সবাই রাত ৩টা ৪৫ মিনিটে ঘুমাতে গেছে। টার্গেট (আমার বাবা) হার্টের ব্যথার কথা জানিয়েছেন।'

এই সমস্ত বিবরণ আমরা কেউই মনে রাখিনি। কিন্তু এগুলো সিকিউরিতেতের কাছ থেকে আমাদের জন্য এক উপহার। তবে বাবার পোশাকে কারাগারের যে গন্ধ ছিল, সেটা আমি আজও মনে করতে পারি।

বাবার জেল থেকে ফেরত আসার কয়েক মাস পর সিক্রেট পুলিশের নোট: রাত ১:৩২ মিনিটে ঘরে বসানো শোনার যন্ত্রের দরজা খোলার চেষ্টা করছে কেউ। তবে দরজা খোলেনি। আমরা কারও দূরে চলে যাওয়ার পায়ের আওয়াজ শুনতে পাই। একই সময়ে অপরিচিত কারও প্রতি কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনতে পাই।

এই প্রতিলিপিটা সিকিউরিতেতের। যারা নিজেরাই সেই রাতে বাড়িতে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল মাইক্রোফোন পাল্টানোর জন্য। গত আগস্টে আমি প্রথমবার এই ফাইলটি পড়ি। এটা পড়ে বুঝতে পারি, সেই দিনগুলোতে রোমানিয়ায় আমরা যতটা গোলমাল শুনেছি, বাস্তবতা আসলে ততটা ছিল না।

রহস্যময় পুরুষদের কাছ থেকে শহরে দেখা করার আমন্ত্রণ, মধ্যরাতে মুঠোফোনে আসা হত্যার হুমকি, এমনকি নারীর পক্ষ থেকে বাবার সঙ্গে সেক্স করতে চেয়ে আসা ফোনকলের পর আমরা সিদ্ধান্ত নিই আমেরিকায় রাজনৈতিক আশ্রয় নেওয়ার। বাবার কারাগারের কাগজপত্র নিয়ে পরিবারের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে আমেরিকান দূতাবাসে যাত্রার পালা ছিল আমার।

দূতাবাসে আমি প্রবেশ করতে পারি। কিন্তু বের হওয়ার পরপরই আমাকে আটক করে ফেলা হয়। টানা ৪৫ মিনিট আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আমাকে যা বলতে বলা হয়েছিল, আমি শুধু তাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলতে থাকি: 'আমরা আমেরিকার হেফাজতে আছি। আপনারা আমাদের যা খুশি করতে পারবেন না।' তারা আমাকে ছেড়ে দেয়, এ-ও বলে দেয় আর কোনো দিন যেন ওখানে না যাই।

সিকিউরিতেতের রেকর্ড দেখে বোঝা যায়, তারা আমাদের বিষয়ে কতটা চিন্তিত ছিল। তারা মাকে আমেরিকায় যেতে নিরুৎসাহিত করতে লাগল, বোঝানোর চেষ্টা করল, পশ্চিমের জীবন ধনী ও অলস পুঁজিপতিদের দাসত্বের মতো। পাসপোর্টের জন্য ১১ মাস আমরা গৃহবন্দী অবস্থায় অপেক্ষা করলাম। একটি রেকর্ড বলছে, 'টার্গেটকে (এইবার আমার মা) চলে যাওয়া থেকে নিরুৎসাহিত করতে সব ধরনের চেষ্টার পর আমরা তাকে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' সিকিউরিতেতের রেকর্ড থেকে জানা যায়, মাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য তাকে বন্ধুদের দিয়ে অপমানের আয়োজনও তারা করেছিল।

'আপনার মেয়েরা পতিতা হয়ে যাবে'–পাসপোর্ট ক্লার্ক মা-বাবাকে চিৎকার করে বলেছিল। বাবার দিকে ফিরে বলেছিল, 'আমাদের হাত অনেক লম্বা।' আমাদের সঙ্গে যা ঘটেছে, আমেরিকায় গিয়ে একবার বললে মৃত্যুর হুমকিও দেওয়া হয়। নথিপত্রে এখন মায়ের ঘোষণাপত্রে পড়ছি, 'কথায় অথবা কাজে আমাদের সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন না করা।' মায়ের দৃঢ়তা দেখে অবাকও হই, চল্লিশের বেশি বয়সী একজন নারী তিনটি শিশু ও শয়তানের আত্মার কাছ থেকে ফেরত আসা স্বামীকে নিয়ে নিজের দেশ ছাড়ছেন এবং কোথায় গিয়ে উঠবেন, তারও ঠিক নেই।

১৯৮৯ সালের শেষে আমরা মিশিগানের পথ ধরি। প্রত্যেকে বয়ে চলেছি একটি করে স্যুটকেস, যেখানে আমাদের পুরো জীবন ধরে রাখা আছে। বার্লিন ওয়াল আমাদের পেছনে ভেঙে পড়ে। ক্রিসমাসের সময় ঘটে রক্তাক্ত রোমানিয়ান বিপ্লব।

১৯৮৯ সালের ১৭ নভেম্বর আমরা রাজনৈতিক উদ্বাস্তু হিসেবে মিশিগানের গ্র্যান্ড র‍্যাপিডসে পৌঁছি। রোম হয়ে তুষারঝড়ের ভেতর রাতের বেলায় পৌঁছি, একটিও ইংরেজি শব্দ না বলে। রোমের

একটি রিফিউজি সেন্টারে আমাদের শেখানো হয় যে আমেরিকানরা গণতন্ত্র এবং বাকস্বাধীনতাকে মূল্য দেয়। সমস্ত রিফিউজি প্রথম বছরেই অন্তত আট কেজি ওজন বাড়িয়ে ফেলে। কারণ, ওখানে খাওয়ার জন্য অনেক খাদ্য আছে। তবে বেশির ভাগই আমাদের বাড়িতে বানানো স্যুপ থেকে ভিন্ন। এরপর আমরা আর বেশি রোমাঞ্চিত হতে পারি না। আমরা পশ্চিমা জীবনে 'আত্তীকরণে' আগ্রহী হয়ে উঠি।

আমি আর আমার বোন গ্র্যান্ড র‍্যাপিডসের লোকজনদের কাছে জানতে চাইতাম: আমাকে কি এখন দেখতে আমেরিকান লাগছে?

একই সময়ে দানসূত্রে পাওয়া টেলিভিশনে আমরা দেখেছি চশেস্কুকে কীভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। বাবা বলেন, 'এটা ভুল। এখন আর বিশ্ব তার কাছ থেকে তার কুকর্মগুলো বের করে আনতে পারবে না।' মা কাঁদেন, 'এরা দুইজন বৃদ্ধ মানুষ মাত্র। এদের হত্যা করা উচিত হয়নি।' এবং বসার ঘরে আমরা সবাই নেচে আনন্দ করলাম এ জন্য যে রোমানিয়ায় একটি বিপ্লব হয়েছে।

আমার ধারণা, বাবার প্রতিবাদ হয়তো এই বিপ্লব ঘটতে কিছুটা হলেও সহায়তা করেছে। বাবা দেশে ফিরে যেতে চাইলেন। আমরা বললাম, 'আমরা এখানেই থাকছি এবং আপনিও এখন আমাদের ছেড়ে কোথাও যাচ্ছেন না।'

বিশ বছর কেটে গেছে। আমরা নার্সিং হোম, গির্জা পরিষ্কারের কাজ করেছি। বার্গার কিংয়ে কাজ করেছি। গলফ ক্লাব বানিয়েছি। মা বাচ্চাদের পোশাক তৈরির কারখানায় কাজ করেছেন। আমরা স্কুলে গিয়েছি। বাবা পরিত্যক্ত যত বাতিল টেলিভিশন আছে, সেগুলো সংগ্রহ করেছেন। মেরামত করেছেন। আমাদের সব রুমে একটি করে টেলিভিশন। 'কী অপচয়!'–বাবা বলেন।

আমরা আমেরিকার নাগরিকত্ব পেয়েছি। আমি আর আমার বোন বিয়ে করেছি। আমার বোন আর তার স্বামী শহরতলিতে বাড়ি করেছে। আমরা জন্মসূত্রে রোমানিয়ান হয়েছি।

যারা কমিউনিস্ট শাসনামলে নজরদারির শিকার হয়েছিল, তাদের জন্য ১৯৯৯ সালে রোমানিয়া সিক্রেট পুলিশের আর্কাইভগুলো উন্মুক্ত করে দেয়। বাবা বলেন, 'আমি জানি আমি কে। সিকিউরিতেত আমাকে নিয়ে কী বলেছে জানার দরকার নেই।' আমি একমত হই না। ২০১০ সালে আমাদের রেকর্ডগুলো খুঁজে বের করি।

সিকিউরিতেতের অনুসরণ ও হুমকি প্রত্যক্ষ করা আমাদের জন্য এক জিনিস, কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের পূর্ণ রেকর্ড পড়তে

বোগান পরিবারের ছবি।

আরেকটা উদাহরণ, একটি শব্দ 'কিংবদন্তি' বা 'লেজেন্ড' (সিকিউরিতেতের ব্যবহৃত সাংকেতিক শব্দ) দিয়ে বোঝানো হচ্ছিল অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের একজন কর্মচারীকে। যিনি মায়ের কাছে বাবার সম্পর্কে জানতে এসেছিলেন, তিনি এ-ও জানতে এসেছিলেন, বাবার কারণে আমরা নির্যাতিত হচ্ছি কি না। এই অফিসারকে জার্মান উচ্চারণ এবং নার্ভাস হওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। উনি মাইক্রোফোনের আওতার বাইরে গিয়ে কথা বলার জন্য মাকে শহরের একটি হোটেলে গিয়ে কথা বলতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

> আমি জানি আমি কে। সিকিউরিতেত আমাকে নিয়ে কী বলেছে জানার দরকার নেই।

মিশিগান এয়ারপোর্ট, ১৭ নভেম্বর ১৯৮৯।

আসলে এটি ছিল মাকে কারাগারে পাঠানোর আরেক ফাঁদ। বাবাকে নিয়ে বিদেশি নাগরিকের সঙ্গে কথা বলার অজুহাতে তাকে ফাঁসানোর চেষ্টা। আবার বিপরীতে আমাদের কাছে এখন অফিশিয়াল নথি রয়েছে, যা দিয়ে আমরা সেই স্মৃতি পরীক্ষা করতে পারি, যেদিন লোকটি আমাদের বাড়িতে এসেছিল। লোকটি চলে যাওয়ার পর মা সেদিন বলেছিলেন, 'আমাদের নিয়ে কেউ চিন্তিত নয়; এই অপরিচিত লোকটাকে আমি বিশ্বাস করি না।' এই বিশ্বাসের অভাবই মাকে সেদিন বাঁচিয়ে দিয়েছিল।

রাতে দেখা স্বপ্নের কথা সকালে আমরা একে অন্যের কাছে যেভাবে বলেছি, তারও রেকর্ড রয়েছে। প্রতিলিপিকারী আমাদের এতটাই ভালো করে চিনতেন, তিনি আমাদের মেজাজও পাঠ করতে এবং যথাযথ নোট নিতে পারতেন। পারিবারিক তর্কেও কখনো কখনো তারা পক্ষ নিয়েছেন, প্রতিলিপির মার্জিনে কে সঠিক, তা-ও নোট করা আছে। এটা অনেকটা আমাদের যন্ত্রণাদায়ক সত্তার সঙ্গে সেই অদৃশ্য প্রতিলিপিকারীদের ওয়ান সাইডেড রিলেশনশিপের মতো।

বলাই বাহুল্য, নথিগুলো হুবহু অক্ষত নেই। কোনো কোনো জায়গা কালো কালি দিয়ে মুছে ফেলা হয়েছে। অনেক পৃষ্ঠা উধাও। আমার কাছে যা, তা কেবল আমার কাছে প্রকাশযোগ্য বলেই দেওয়া হয়েছে। তবে হ্যাঁ, বাবা আমাদের জেলখানা থেকে যেসব চিঠি দিয়েছেন বা আমরা তাকে যে চিঠি দিয়েছি, তার প্রতিটা এখন আমাদের কাছে আছে। অর্ধেক চিঠি সরাসরি ট্রান্সক্রিপ্ট করা হয়েছে–সেন্সর করে সেগুলোর অনুলিপি করা হয়েছে। আবার যখন আমরা লিখেছি, তখন অর্ধেক চিঠির প্যারাফ্রেজ করা হয়েছে। কোন শব্দটি আমাদের আর কোনটি ওদের বসানো, তা বোঝাতে সব জায়গায় উদ্ধৃতি চিহ্ন নেই। সিকিউরিতেতের শব্দ থেকে আলাদা করা বেশ কঠিন। কিছু চিঠি কখনো আমাদের কাছে পাঠানো হয়নি। গত গ্রীষ্মে সেগুলো আমি প্রথমবার পড়েছি।

১৯৮৩ সালের ১০ মার্চ বুখারেস্টে যাওয়ার সময় আমার বাবা কী ভাবছিলেন, এই প্রশ্নটি বহু বছর ধরে তার বেদনার তীব্রতা হারিয়েছে। তবুও ফাইলগুলোয় আমাদের নিত্যদিনের দোষারোপ এবং ক্ষোভের ধারাপাত দেখি। ২০১৩ সালের অক্টোবরে পরিবার নিয়ে আমরা রোমানিয়ায় না গেলে এই প্রশ্নটি উত্তরহীন থেকে যেত। ২০১৩ সালে বাবার বয়স ৭৮, মায়ের বয়স ৬৭, ফিরতি যাত্রার জন্য এটি একটি দারুণ সময়।

আগে যা বুঝতে পারিনি, তা বাবার কারাগার জিলাভা ও আইয়ুদে এবং সম্পূর্ণ অন্ধকারে নিমজ্জিত সেল, হাড় কাঁপানো স্যাঁতসেঁতে মেজেতে হেঁটে ও পাঁজর ভাঙা নিয়ে বাবার কারাগারের হাসপাতালে ভর্তির নথিতে আঙুলে হাতুড়ি পেটার কালশিটে দাগের কথা পড়ে বুঝতে পারি।

যখন তিনি বাড়ি থেকে বের হচ্ছিলেন, তখন পুরো কার ভর্তি ছিল লিফলেটে। আমার বাবা জানতেন তিনি কী নিয়ে ফিরছেন। তবুও তার কোনো উপায় ছিল না। তার কাছে পরিবারই ছিল দেশ, দেশই ছিল পরিবার। তিনি সবার জন্য লড়াই না করলে আমাদের নিজের টেবিলে খাবার দেওয়ার আশা করতে পারতেন না। অথবা আমাদের জীবনে মর্যাদার একটি অংশ দিতে পারতেন না। তিনি আমাদের হতাশ এবং নৈতিক অপরাধী হওয়া থেকে দূরে রেখে গেছেন।

আমাদের কিছু না বলে তিনি আমাদের রক্ষা করেছেন। কিন্তু এ কথা আপনি শুধু তখনই বুঝবেন, যখন কারাগারের সেই কক্ষগুলোতে নিজে যাবেন, যেখানে বাবা নির্যাতিত হয়েছেন। তিনি যখন চিৎকার করে বলেন, মারধরের কোনো স্মৃতি তার নেই, অথচ তার পাঁজর ভাঙা, এমনাবস্থায় আপনি রেডিওগ্রাফির রেকর্ড হাতে নিয়ে তার মুখোমুখি হলে বুঝতে পারবেন। এটি বীরত্বের এমন এক দিক, যা নিয়ে কেউ কথা বলতে চায় না, তিনি নিজেও না। কিন্তু এটাই বীরত্বের সেই মুখ, যা এখন আমাকে গর্বিত করে।

৭৫ বছরে ‘তিথিডোর’

কোথায় রয়েছে ভাবি লুকিয়ে বিষাদ তবুও...

মাহমুদ নেওয়াজ জয়

আজ থেকে ৭৫ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল এই উপন্যাস। সে ১৯৪৯ সালের কথা। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ ঘটেছে আরও আট বছর আগেই। সে সময়ে তাই বলা যেতে পারে ‘রবীন্দ্রযুগ’ আর নেই। তবে সাগরে কল্লোল উঠেছিল আরও আগেই। ত্রিশের দশক থেকেই রবীন্দ্রসাহিত্যের ছায়া অতিক্রম করে কয়েকজন তরুণ লেখক নিজেদের স্বতন্ত্র ধরন গড়ার কাজ করছিলেন। তাদেরই একজন বুদ্ধদেব বসু।

বুদ্ধদেব পরিচিতি পেয়েছিলেন কবি হিসেবে, এর বাইরে সাহিত্য সমালোচনার জন্যও খ্যাতি পেতে শুরু করেছেন তিনি। সে সময়ই লিখলেন তার উপন্যাস ‘তিথিডোর’।

তিথি বলতে বোঝানো হয় ক্ষণ বা লগ্ন। আর ডোর অর্থ বন্ধন। যারা উপন্যাসটি পড়েছেন, তারা জানেন যে একান্নবর্তী পরিবারের সদস্যদের মধ্যকার বন্ধন এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়। কিন্তু এত সম্পর্ক, এত বন্ধন, এত টানও আটকে রাখতে পারে না মানুষকে। এত কিছু থাকার পরও মনে হয় ‘অবশেষে জেনেছি মানুষ একা...’

এই একাকিত্ব আর নিঃসঙ্গতার বুনন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠাজুড়ে বুনে গেছেন বুদ্ধদেব বসু। উল্লেখ্য, রবীন্দ্র প্রভাব বলয়ের বাইরে এসে সে সময়ের পঞ্চপাণ্ডবগণ (বুদ্ধদেব, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় ও বিষ্ণু) নিজেদের উদ্যোগে সাহিত্যে নতুন স্বাদ প্রদান ও নিরীক্ষার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তবে তারা সকলেই ছিলেন সাহিত্যে ‘আর্টস ফর আর্টস সেক’ বা কলাকৈবল্যবাদে বিশ্বাসী। এদিক থেকে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাদের একটা মিলও পাওয়া যায়। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর পৃথিবীর পরিবর্তিত সমীকরণ আর দেশে দেশে এসে লাগা তার ঢেউ থেকে বাংলা সাহিত্যও দূরে থাকেনি।

বুদ্ধদেব বসু কলাকৈবল্যবাদে আস্থা রাখলেও মধ্যবিত্ত পরিবারের দিনযাপনের অনুপম চিত্র এঁকেছেন ‘তিথিডোর’-এ।

বুদ্ধদেব বসুর এই উপন্যাসটি যখন প্রকাশিত হলো (১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর), তখন গোটা পৃথিবী শিল্পবিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অনেকগুলো দেশ তখন উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শুরু হয়েছে স্নায়ুযুদ্ধ। পৃথিবী তখন মোটাদাগে দুই শিবিরে বিভক্ত। তবে বুদ্ধদেবের উপন্যাসের সময়কাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের পৃথিবী নয়, বরং প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী থেকে এর কাহিনির অবতারণা হয়ে শেষ হয়েছে ১৯৪১ সালে এসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখনো চলমান। এর মাঝে যুক্ত হয়েছে নাগরিক জীবনের নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও সমীকরণ। শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে শহর গড়ে উঠছে, নাগরিক জীবনে ক্রমে মানুষের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে মানুষ। এর সঙ্গে বাড়ছে নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব।

‘তিথিডোর’ উপন্যাসটির কাহিনিতে যাওয়া যাক। উপন্যাসের সূচনা রাজেনবাবুকে কেন্দ্র করে, যবনিকাও তাকে কেন্দ্র করেই। রাজেনবাবুর কন্যা স্বাতী এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র বা প্রোটাগনিস্ট। তার সঙ্গে প্রফেসর সত্যেনের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে সূচনা হয় প্রেমের সম্পর্কের। এই স্নিগ্ধ প্রেম আখ্যান উপন্যাসের কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তবে এটি নিছক প্রেম আখ্যান নয়; এককথায় একে প্রেমের উপন্যাসও বলা যায় না। প্রেম এখানে গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে আছে, তবে নর-নারীর ভালোবাসার সরল প্রথাগত কোনো আখ্যান নয় ‘তিথিডোর’। এখানে উঠে এসেছে আরও অনেক কিছু।

উপন্যাসজুড়েই মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারগুলোর দৈনন্দিন জীবনযাপন, সম্পর্ক ও আরও নানান ডাইমেনশন হাজির হয়েছে পাঠকের সামনে। যে সময়টায় নগরজীবনের বিকাশ ঘটছে, মানুষ মানুষের থেকে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, সে সময়ে বাঙালি মধ্যবিত্তের যে চিরাচরিত মূল্যবোধ ও সংস্কার, তাতেও লাগছে ধাক্কা, উঠছে নতুন ঢেউ। এভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত তার জীবন থেকে যা হারিয়ে ফেলছে, সেসবও উঠে এসেছে উপন্যাসটিতে।

উপন্যাসটির কাহিনি বিন্যাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি, তিন ভাগে ভাগ করে লেখক এর কাহিনি বর্ণনা করেছেন। অংশ তিনটি হলো: ‘প্রথম শাড়ি: প্রথম শ্রাবণ’, ‘করুণ রঙিন পথ’ ও ‘যবনিকা কম্পমান’।

উপন্যাসের শুরুতে আমরা দেখি রাজেনবাবু ও তার স্ত্রী শিশিরকণার সংসারের চিত্র। তাদের ঘর আলো করে ক্রমে জন্ম নিল ছয় সন্তান–পাঁচ কন্যা আর এক পুত্র। মেয়েদের নাম শ্বেতা, মহাশ্বেতা, সরস্বতী, শাশ্বতী, স্বাতী। একমাত্র ছেলে বিজন। সময় বয়ে যেতে থাকে, ক্রমান্বয়ে রাজেনবাবুর বড় তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। শ্বেতার সঙ্গে প্রথমেশের, মহাশ্বেতার সঙ্গে হেমাঙ্গের ও সরস্বতীর সঙ্গে অরুণের। তারা চলে গেল শ্বশুরবাড়ি। স্ত্রী শিশিরকণা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একসময় পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে পরলোকে পাড়ি জমালেন তিনি।

রাজেনবাবুর কন্যাদের মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠ স্বাতী। শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণ, তারপর কিশোর বয়স পেরিয়ে যৌবনে অধিষ্ঠিত হওয়া–স্বাতীর এই ক্রমে বিকাশমান জীবন ও এর সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালে হতে থাকা তার চিন্তার বিবর্তন নিয়ে এই উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সত্যেনের সঙ্গে তার ভালোবাসার সম্পর্কের কথা।

স্বাতীর দিদি শাশ্বতীরও একপর্যায়ে বিয়ে হয়ে যায়। তার স্বামী হারীত একজন কমিউনিস্ট, সক্রিয়ভাবে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। হারীতের চরিত্রটির মধ্য দিয়ে লেখক সে সময়ের রাজনীতিটাকেও উপন্যাসে তুলে আনার প্রয়াস নিয়েছেন। যেমন জার্মানিতে হিটলারের শাসন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের ভূমিকা, বার্মা (মিয়ানমার) দখলের মতো নানান প্রসঙ্গে তীব্র মন্তব্য করতে দেখা গেছে হারীতকে। উপন্যাসে তাকে দেখা যায়, পরিবেশ-পরিস্থিতি বিচার না করেই যেকোনো জায়গায় রাজনৈতিক আলাপে জড়িয়ে পড়তে ও অন্যদের রাজনৈতিক জ্ঞান নিয়ে তাচ্ছিল্যের মনোভাব পোষণ করতে। উল্লেখ্য, বুদ্ধদেব বসু কলাকৈবল্যবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় বামপন্থী সাহিত্যিকদের সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুব বেশি মসৃণ ছিল না। হারীতের এই চরিত্রটি চিত্রণের মধ্যে হয়তো সেই ব্যাপারটির প্রভাব থেকে থাকতে পারে। তবে হারীতের সঙ্গে শাশ্বতীর দাম্পত্য সম্পর্কেও দূরত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। নিঃসঙ্গতার কানাগলিতে তাদের সম্পর্কটিও ঘুরপাক খেতে থাকে। এই উপন্যাসে তাদের এই সম্পর্কের জটিলতা বেশ ভালো স্থান জুড়ে আছে।

একমাত্র ছেলে বিজনকে নিয়ে অনেক আশা ও প্রত্যাশা ছিল রাজেনবাবুর। কিন্তু বিজন পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। মাহারা বিজনকে স্নেহ ও শাসনের মায়াডোরে বেঁধে রাখার তেমন কেউ আর রইল না। রাজেনবাবুরও বয়স বাড়তে থাকল, সব দিকে খেয়াল দেয়ার মতো সময় বা সামর্থ তারও আর অতটা রইল না।

মাবিহীন পরিবারে ও বোনদের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় স্বাতী আগের চেয়ে একা হয়ে পড়ে। পরিবারে তার ক্রমে বেড়ে ওঠার সময়টায় বাবার সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘনিষ্ট হয়। পিতা ও কন্যার সম্পর্কের গভীর অনুপম রসায়ন সৃষ্টি করেছেন বুদ্ধদেব বসু। এর সঙ্গে রয়েছে পারিবারিক

অলংকরণ: মাহাতাব রশীদ

আটপৌরে ব্যাপারসমূহ এবং মান-অভিমান ও স্নেহ-ভালোবাসার নিবিড় চিত্র অঙ্কন।

স্বাতী যখন কলেজে উঠেছে, ওই সময়ে সে কিশোরী। জীবনের নতুন দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে তার সামনে। একজন কিশোরী থেকে পূর্ণবয়স্ক নারী হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে সে। তৈরি হচ্ছে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। এ সময়েই তার জীবনে আসে ভালোবাসার সেই স্নিগ্ধ অনুভূতি। কলেজের তরুণ লেকচারার সত্যেনের সঙ্গে স্বাতীর পরিচয় হয়। সত্যেনের বাবা-মা কেউ নেই। পারিবারিক বন্ধন থেকে একেবারেই মুক্ত সে, একেবারেই নিঃসঙ্গ। এদিকে মাকে হারিয়ে ও দিদিদের বিয়ে হয়ে যাওয়াতে স্বাতীও ক্রমান্বয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছিল। সে সময় ভালোবাসা যেন এল দমকা হাওয়া হয়ে, চৈত্রের দাবদাহে বৈশাখের প্রথম বৃষ্টির মতো। স্বাতী ও সত্যেন উভয়ে উভয়কে নিজেদের মনের সুন্দরতম অনুভূতি ও নিঃসঙ্গতার কথা লিখতে থাকল। এভাবে পত্র বিনিময় হতে থাকল নিয়মিত।

এমন একটি চিঠি পাঠকদের জন্য তুলে ধরা যাক:
(স্বাতী লিখেছে সত্যেনকে)

‘মন খারাপ মানুষের কখন লাগে আর কেন লাগে, তার কি কোনো নিয়ম আছে? কিছুর মধ্যে কিছু না–সব ঠিক–সব ভালো...হঠাৎ শ্রীযুক্ত মন খারাপ এসে হাজির হলেন, যেন আর নড়বেন না এখান থেকে। তা লোক কিন্তু উনি অত খারাপ নন, মানে মন খারাপ হওয়াটাই যে খারাপ তা কিন্তু ঠিক নয়–আমার তো বেশ ভালোই লাগে একেক সময়।

‘আর মন খারাপের ভালো লাগাটা বলতে হয়–মানে বলতে চায় মানুষ, কিন্তু বলতে পারে না। আর পারে না বলেই কি গান বানায়, কবিতা লেখে?’

সহজসরল আবেগিক প্রকাশ, অথচ কত গভীর এই চিঠির ভাব। সদ্য কলেজে পড়তে আসা একজন কিশোরী যেন তার মনের আকাশে জমা হওয়া কালো মেঘের সুলুকসন্ধান করে তার বিবরণ পৌঁছে দিচ্ছে ভালোবাসার মানুষটির কাছে। একই সঙ্গে এই নিঃসঙ্গতা থেকে আশ্রয় খুঁজে চলেছে গান আর কবিতার মধ্যে।

পাঠকদের মনে হতে পারে, এই উপন্যাসে তবে কি শুধু নিস্তরঙ্গভাবে নিজেদের অনুভূতির খেরোখাতা খুলেই সব লিখে গেলেন চরিত্ররা? না, ব্যাপারটি তা নয়। ভালোবাসার সম্পর্কে এখানে কারও পরিবারের তরফে বাধা আসে না ঠিক; কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব ঘটে।

শ্বেতা তার স্বামী প্রথমেশকে হারিয়ে বিধবা হয়ে সন্তানসমেত বাপের বাড়িতে ফিরে আসে। এদিকে লেখাপড়ায় ব্যর্থ হওয়া বিজনকে আমরা দেখি নতুন ব্যবসা খুলে বসতে। সময়টা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার। সাল ১৯৪১। এ সময় বিশ্বযুদ্ধকে কেন্দ্র করে সংকটে পড়া মানুষদের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে বিজন ব্যবসা ফেঁদে বসে। তার গুরু প্রবীর মজুমদার মোটেই সুবিধের লোক নন, কিন্তু বিজন তার ওপরে খুবই আস্থা রাখে।

এখানেই শুরু হয় ভালোবাসার সম্পর্কে সেই দ্বন্দ্বের। স্বাতীকে পছন্দ হয় প্রবীর মজুমদারের। তাকে স্ত্রী হিসেবে পেতে চান তিনি। কিন্তু স্বাতী তো মন দিয়ে ফেলেছে সত্যেনকে।

চিঠি বিনিময় হওয়ার সময় থেকেই পারস্পরিক দুর্বলতা অনুভব করলেও সত্যেন নিজে পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন না। পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক সকল বন্ধনমুক্ত সত্যেন নতুন করে কোনো বন্ধনে আটকা পড়তে চান কি না, তা তার কাছে পরিষ্কার ছিল না। কিন্তু স্বাতী যেমন বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে নিজেকে আশপাশের জগৎ থেকে গুটিয়ে নিয়েছে, নিজে চারপাশের সঙ্গে একটা দেয়াল তৈরি করে নিয়েছে; বিপরীতে সত্যেন যাপন করছে একদম স্বাধীন জীবন। কিন্তু দুজনের জীবনেই একটি জিনিস উপস্থিত–নিঃসঙ্গতা। আর এই নিঃসঙ্গতাই তাদের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।

এরপর কি স্বাতী আর সত্যেন নিজেদের ভালো লাগাকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে নাকি প্রবীর মজুমদারের দুরভিসন্ধির জয় হয়? স্বাতী আর সত্যেনের নিঃসঙ্গতার শূন্যস্থান কি তারা পূর্ণ করেন, নাকি নিজেদের জীবন নিজেদের মতো করেই বয়ে নিয়ে যান, এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেওয়ার ভার পাঠকের ওপরেই থাক।

বুদ্ধদেব বসুর এই উপন্যাসটির পাতায় পাতায় আছে কাব্যিকতার ছোঁয়া। উপন্যাসটি সমুদ্রের তীব্র ঝড় নেই, আছে নদীর শান্ত বয়ে চলা। প্রতিটি চরিত্রকে বুদ্ধদেব সময় নিয়ে গড়েছেন, বেশ ‘ডিটেলে’ উপস্থাপন করেছেন। চরিত্রগুলোর চিত্রণ হয়েছে গভীর মমতার সঙ্গে, আটপৌরে জীবনের নানান মুহূর্ত কিংবা নিঃসঙ্গতার অনুভূতি নিয়ে জেগে কাটানো রাত–সবকিছুই কাব্যিক ব্যঞ্জনায় উপস্থিত হয়েছে, যা পাঠকের অনুভূতির সঙ্গে মিশে যেতে সক্ষম।

উপন্যাসটিতে একদম ‘ব্ল্যাক হোয়াইট’ হিসেবে কোনো চরিত্রকে তুলে ধরা হয়নি। এখানে মানুষের মধ্যে থাকা চিরাচরিত ভালো ও মন্দের, গুণ ও দোষের সমাহারকেই দেখানো হয়েছে। সহজ কথায় ‘গ্রে এরিয়া’ আছে চরিত্রগুলোর চিত্রণে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো মমত্ববোধ। বুদ্ধদেব বসু তার এই উপন্যাসে প্রতিটি চরিত্রকে পরম মমতায় চিত্রিত করেছেন।

এ ব্যাপারে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, ‘কলকাতার ছা-পোষা মধ্যবিত্ত জীবনের যা কিছু গৌরব, তার যা কিছু সততা–সমস্তের আশ্চর্য পরিবারকেন্দ্রিক চিত্র “তিথিডোর”। এই উপন্যাসের যে স্নিগ্ধ দিনগুলো আর একটু পরেই বাংলাদেশ হারিয়ে ফেলল, তার শেষ অকৃত্রিম চিহ্ন হিসেবে আমরা মনে রাখব।’

‘তিথিডোর’ পাঠকের নিজের ভেতরে জমে থাকা অনুভূতি, বিচ্ছিন্নতা, দুঃখবোধ ও নিঃসঙ্গতাকে প্রশমিত করবে। কাউকে না বলা কথাগুলো কিংবা জমে থাকা দুঃখগুলোর ভার হালকা হবে। পাঠক বইটির মাঝে খুঁজে পাবেন নিজেকে। এই চিরায়ত অনুভূতি উপন্যাসটিকেও দিয়েছে চিরায়ত স্থায়িত্ব।

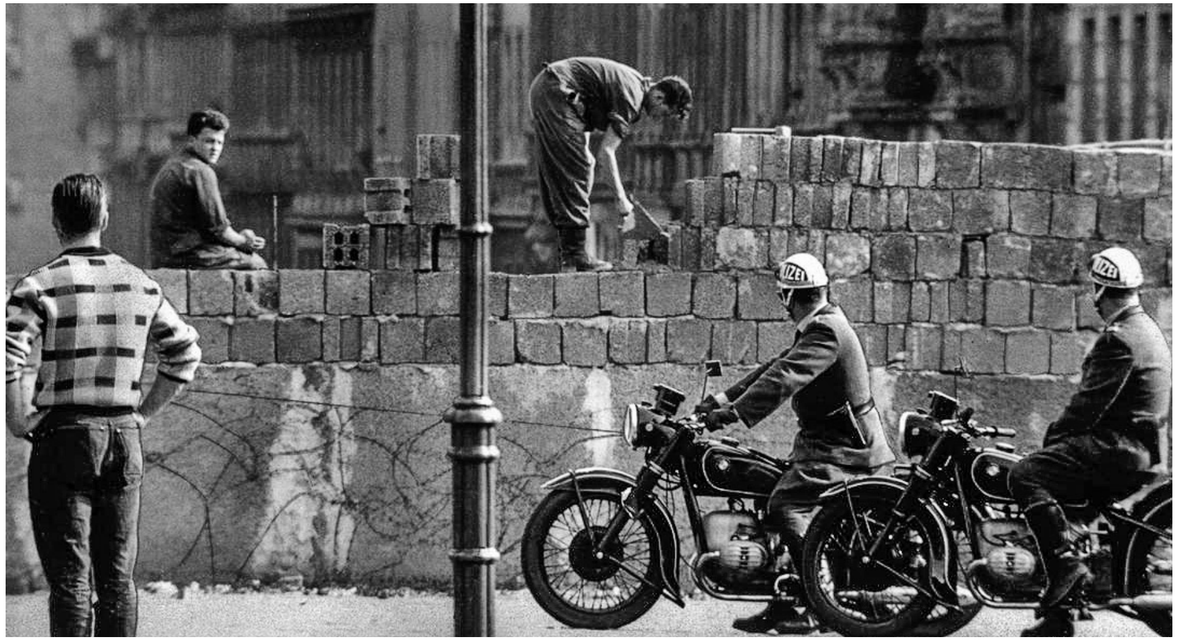

আগস্ট ১৯৬১, দুই জার্মানীর মধ্যকার দেয়ালের কাজ শেষ দিকে।

ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও লাতিন আমেরিকায় গুপ্ত পুলিশের

১৬ পৃষ্ঠার পর

দেওয়া হতো। প্রতিশ্রুত এক শ ডলার সমপরিমাণ বোনাস পেতে পদস্থ সেনা কর্মকর্তাদের ছয় বছর ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছে। সেনাদের অনেক সময় কায়িক শ্রমে বাধ্য করা হতো, যেখানে 'সেকুরিতাতে'র সদস্যদের এমন কাজ কখনোই করতে হতো না।

'সেকুরিতাতে'র জন্য বরাদ্দ ছিল অঢেল অর্থ, ভালো প্রশিক্ষণ আর উন্নত অস্ত্র। সেনারা দুই বছরে মাত্র চারটা বুলেট পেত। কিন্তু 'সেকুরিতাতে'র কাছে অগণিত গোলাবারুদ থাকত। আর ছিল রাতের বেলায় দেখার নাইট ভিশন ক্ষমতাসম্পন্ন আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। এ জন্য 'সেকুরিতাতে' সেনাবাহিনীর চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক ছিল।

'সেকুরিতাতে'র বদ্ধমূল ধারণা ছিল চশেস্কুর নিরাপত্তা মানেই তাদের নিজের নিরাপত্তা। তারা চশেস্কুর আদেশ পালন করত, কমিউনিস্ট নেতাদের রক্ষা করত। চশেস্কু আর তার পরিবারকে সুরক্ষিত রাখাই ছিল এ বাহিনীর প্রধান কাজ।

চশেস্কু গুপ্তঘাতকের ভয়ে দিন কাটাতেন। কিউবার ফিদেল কাস্ত্রো বলেছিলেন, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ তাকে বিষমাখানো জুতা পরিয়ে তাকে খুনের চেষ্টা করেছিল। এমন ঘটনা এড়াতে 'সেকুরিতাতে' চশেস্কুর জন্য এক বছরের কাপড়চোপড়, জুতা-মোজা এক গোপন গুদামে কড়া পাহারায় জমা করে রাখত। প্রতিদিন সেই কাপড় পরীক্ষা করে তাকে পরতে দেওয়া হতো। তারপরও বিষ লাগতে পারে এ আশঙ্কায় কাপড়চোপড় খোলা মাত্র দিন শেষে সেগুলো নষ্ট করে ফেলা হতো।

সেকুরিতাতে গোয়েন্দারা চশেস্কু পরিবারের সেবা করার পাশাপাশি সাঁজোয়া যান এবং হেলিকপ্টার নিয়ে রোমানিয়ার সীমান্তেও টহল দিত। রাজনৈতিক বন্দীদের আটক রাখা হয়েছে এমন সব কারাগারের পাহারায় তাদের মোতায়েন করা হতো। রাজনৈতিক বন্দী নির্যাতনের দায়িত্বে ছিল সেকুরিতাত 'র সার্ভিস কে' নামে পরিচিত একটি দল।

রোমানিয়ার প্রায় সবকিছুর ওপরেই একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল সেকুরিতাতে। ১ লাখ ৮০ হাজার উর্দিধারী গোয়েন্দার

নাগরিকের উপর নজরদারির গোপন নথি।

সাথে আরও ছিল ৩০ লাখ সহযোগী চর বা তথ্যদাতা। রোমানিয়ার নাগরিকদের ওপর নিয়মিত নজরদারি চালানোর জন্য টেলিফোনে আড়ি পাতা, ফোনালাপ রেকর্ড করার সব রকম জন্য উন্নত সরঞ্জামই ছিল এ গুপ্ত পুলিশের কাছে।

শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রেও নজরদারি চালাত তারা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না। সরকারবিরোধী কথাবার্তা বললেই দশ শিকের পেছনে পুরে দেওয়া হতো। বইয়ের দোকানগুলোয় চশেস্কু এবং তার স্ত্রী এলিনার লেখা বই রাখতে বাধ্য করা হতো। দেশটিতে বিদেশি বই বা সাময়িকী নিষিদ্ধ ছিল। গ্রন্থাগার থেকে বিদেশি বই ধার নিতে চাইলে সেকুরিতাতের লিখিত অনুমতির প্রয়োজন ছিল।

সরকারবিরোধী কাজ যেন ব্যবহার না করা যায়, সে জন্য টাইপরাইটার এবং তার নমুনা পৃষ্ঠাগুলো নিবন্ধন করতে হতো। এমনকি নাগরিকদের হাতের লেখার নমুনাও সংগ্রহ করা হতো। মানুষ বিশ্বাস করত, কেউ যদি সেকুরিতাতের মানবাধিকার লঙ্ঘনের তথ্য নিয়ে কোনো বেনামি চিঠি বিদেশি সংবাদমাধ্যমে পাঠায়, তবুও তাকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া হবে। রোমানিয়ার মানুষের জন্য বিদেশিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা নিষিদ্ধ ছিল। ঘটনাক্রমে বিদেশিদের সাথে কথাবার্তা হলে তার প্রতিবেদন দাখিল করাও বাধ্যতামূলক ছিল।

সেকুরিতাতে তাদের নিষ্ঠুরতার জন্য কমিউনিস্ট বিশ্বের ইতিহাসে অন্যতম ভয়ংকর গুপ্ত পুলিশ বাহিনী হিসেবে পরিচিতি পায়। তাদের সদর দপ্তরের নিচতলায় অত্যাধুনিক নির্যাতনের সরঞ্জাম–যার মধ্যে বৈদ্যুতিক শক মেশিন, অপারেশন টেবিল এবং নির্যাতনের নানা যন্ত্র ছিল। সেকুরিতাতে এজেন্টদের কোনো কারণ ছাড়াই মানুষ হত্যার অনুমতি দেওয়া ছিল। অবৈধভাবে সীমান্ত পার হওয়ার শাস্তি ছিল তিন বছরের জেল, কিন্তু সেকুরিতাতের হাতে ধরা পড়লে তাদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাথে সাথে গুলি করে মেরে ফেলা হতো।

১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর তিমিসোয়ার শহরে চশেস্কুবিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনা পরম্পরায় সেনাবাহিনী বিক্ষোভকারীদের পাশে দাঁড়ায়। সেকুরিতাতে ঘটনা সামাল দিতে ব্যর্থ হয়। তাদের হামলায় বহু পুরুষ, নারী ও শিশু নিহত হয়। তবে পরিস্থিতি দ্রুত তাদের হাতের বাইরে চলে যায়। এ বিক্ষোভ রাজধানী বুখারেস্টসহ সবখানে ছড়িয়ে পড়ে। চশেস্কু নিজ সমর্থনে রাজধানীতে সমাবেশের ডাক দেয়। কিন্তু সমাবেশে উপস্থিত হওয়ার পর জনতা তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পরিস্থিতি বেগতিক থেকে চশেস্কু সস্ত্রীক দেশ ছেড়ে সরে পড়ার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু সে সময়ে তার গড়ে তোলা সেকুরিতাতের সাথে সংঘর্ষের মধ্যেই দেশটিতে নতুন সরকার গঠিত হয় এবং নিকোলা চশেস্কু এবং তার স্ত্রী এলেনা চশেস্কুকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয় নতুন সরকার। এরপর সামরিক আদালতে বিচারের ১৯৮৯-এর বড়দিনের সন্ধ্যায় এই দম্পতির প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হয়। ফায়ারিং স্কোয়াডের জন্য মাত্র তিনজন সেনার দরকার থাকলেও তিন শর বেশি সেনা এ কাজের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিল।

মধ্য ইউরোপে আবারও সবচেয়ে বড় দেশে পরিণত হয়েছে জার্মানি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪১ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত দেশটিকে পূর্ব জার্মানি এবং পশ্চিম জার্মানি এই দুই খণ্ডে ভাগ করা হয়েছিল। পূর্ব জার্মানির মূল নিয়ন্ত্রণে থাকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন; অন্যদিকে পশ্চিমা মিত্রদের হাতে থাকে পশ্চিম জার্মানি। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত বার্লিন প্রাচীর দুই জার্মানির বিভক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছিল। বিভেদের এ প্রাচীর ২৮ বছর ধরে ১৯৮৯ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিল। পূর্ব জার্মানি থেকে যারা এ প্রাচীর টপকাতে চেষ্টা করেছে, তারাই জীবনের ঝুঁকিতে পড়েছে কিংবা প্রাণ দিয়েছে।

পূর্ব জার্মানিকে সোভিয়েত আদলে গড়ে তোলা হয়। দেশটির গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নিয়ন্ত্রণে থাকে জার্মানির কমিউনিস্টরা। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান থেকে খামার বা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান কবজা করে সোভিয়েতরা। এসব সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নিজেদের ধাঁচে গড়ে তোলা হতে থাকে। এ পদ্ধতির বিরুদ্ধাচারণ করা মানেই হলে বন্দিশিবিরে চালান হওয়া। ইস্ট জার্মান মিনিস্ট্রি ফর স্টেট সিকিউরিটি সংক্ষেপে স্ট্যাসি জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক বা জিডিআর সরকারের দেশকে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। স্বদেশে এবং বিদেশে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক অঙ্গন উভয় স্থানেই স্ট্যাসি সমানতালে তৎপরতা চালিয়েছে।

প্রায় ৯০ হাজার নিয়মিত সদস্যের এ বাহিনীর চর হিসেবে কাজ করেছিল আরও প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার সদস্য। তবে এসবই আনুমানিক সংখ্যা। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের শক্তিশালী এবং সর্বব্যাপী গোয়েন্দা এবং গুপ্ত পুলিশ সংস্থাগুলোর অন্যতম হয়ে উঠেছিল স্ট্যাসি। পূর্ব জার্মানির মানুষকে রাষ্ট্রের তাঁবেদার বানিয়ে রাখার জন্য তাদের ওপর চোখ রাখাসহ অপহরণ, নির্যাতনসহ সব অপকৌশলের আশ্রয় নিতে দ্বিধা করত না সংস্থাটি। ফোনে আড়ি পাতা, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র বা ডায়েরি হাতিয়ে নিয়ে পড়াসহ সব গোয়েন্দা তৎপরতায় দক্ষ ছিল স্ট্যাসি। জার্মান নাগরিকদের ওপর নজরদারির নথির ওজন পাঁচ হাজার টনের বেশি ছিল। এসব নথি একটার পর একটা সাজিয়ে রাখা হলে পাঁচ শ মাইলের বেশি হতো বলে অনুমান করা হয়।

বার্লিনের প্রাচীরের পতনের মধ্য দিয়ে জিডিআর সরকারের পতন ঘটে। একই সাথে অবসান হয় স্ট্যাসির ভয়াল যুগের।

১৯৮০-এর দশকে এল সালভাদোরের হোসে নামের এক ব্যক্তিকে একদল সাদাপোশাকের সশস্ত্র লোক অপহরণ করে। তাকর হাত ও চোখ বেঁধে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গোপন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নির্যাতন চলে তার ওপর। কিন্তু তাকে আইনের হাতে সোপর্দ করা হয়নি, এমনকি কোনো অভিযোগ আনা হয়নি। আট দিন পর হোসে এবং আরও দুই বন্দীকে এক প্রত্যন্ত এলাকায় নিয়ে গুলি করা হয়। কিন্তু অলৌকিকভাবে হোসে বেঁচে যায়। এক পরিবার তাকে রাস্তা থেকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে সেখানেও তার খোঁজে হাজির হয়ে যায় সৈন্যরা। তবে নার্সরা নিরাপত্তা বাহিনী খুঁজে পাওয়ার আগেই তাকে লুকিয়ে ফেলে। পরে সুস্থ হয়ে দেশ ছেড়ে পালায় হোসে। আর কখনো ফিরে আসেনি।

মধ্য আমেরিকার ছোট দেশ এল সালভাদর দীর্ঘদিন দারিদ্র্য, বৈষম্য এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে কাটিয়েছে। ১৯৮০-এর দশকে সরকারের সঙ্গে বিদ্রোহী বাহিনীর যুদ্ধ শুরু হয়। সরকার ডেথ স্কোয়াড তৈরি করে। এই সিক্রেট পুলিশ বাহিনী সাদাপোশাকে বিরোধীদের ওপর নির্বচারে হত্যা ও নির্যাতন চালায়। এদের হাতে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায়।

ডেথ স্কোয়াডের অন্যতম সাড়া জাগানো শিকার হয়েছিলেন আর্চবিশপ অস্কার রোমেরো। তিনি সরকারের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে এবং সৈন্যদের হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করতে বলে রোষানলে পড়েন। ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রার্থনা অনুষ্ঠানের সময় তাকে হত্যা করা হয়। সাক্ষী-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও হত্যাকারীরা শাস্তি পায়নি।

এল সালভাদরে শিক্ষক, শ্রমিকনেতা এবং মানবাধিকারকর্মী কেউই হামলা থেকে রেহাই পায়নি। বিচারপতিরা তদন্ত করতে গিয়ে প্রাণনাশের হুমকিতে পড়েছেন। কিংবা নিহত হয়েছেন। ডেথ স্কোয়াড বছরের পর বছর ধরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এবং দেশের ওপর শাসকের কঠোর শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রেখেছে।

১৯৮০-এর দশকের সূচনায় হুড়রাসে মারাত্মক মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটে। ব্যাটালিয়ন ৩-১৬ নামে পরিচিত একটি গুপ্ত সামরিক দল বহু মানুষকে অপহরণ, গুম, নির্যাতন ও হত্যা করে। ব্যাটালিয়ন ৩-১৬ শিক্ষার্থী, শ্রমিকনেতা এবং রাজনৈতিক কর্মীদের সরকারবিরোধী বলে চিহ্নিত করত। ভয়ভীতি, মানসিক নির্যাতনে কাজ না হলে নির্দ্বিধায় হত্যা করত। হত্যার পর লাশ ফেলে রাখা হতো প্রকাশ্যে। তাদের হাতে বন্দী থাকা, বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া মানুষের কপালে কী ঘটেছে, কোনো দিনই জানা যায়নি। পাওয়া যায়নি তাদের মৃতদেহও।

তৎকালীন সামরিক কমান্ডার জেনারেল গুস্তাভো আলভারেজ মার্টিনেজ এই নির্যাতন ও হত্যার জন্য দায়ী ছিলেন। তার হুকুমে বহু মানুষকে অপহরণ, গুম, জিজ্ঞাসাবাদ ও হত্যা করা হয়। পরবর্তী সময়ে কিছু সামরিক কর্মকর্তা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং তার কুকীর্তি ফাঁস করে দেয়। ফাঁস করা তথ্য থেকে জানা যায়, ব্যাটালিয়ন ৩-১৬-কে যুক্তরাষ্ট্র প্রশিক্ষণ এবং তহবিলের জোগান দিয়েছিল।

জেনারেল আলভারেজ শেষ পর্যন্ত নির্বাসিত হন।

সাভাক (সাযমান-ই এত্তেলাআত ভা আমনিয়াত-ই কেশভার বা জাতীয় গোয়েন্দা এবং নিরাপত্তা সংস্থা) ছিল ইরানের গুপ্ত পুলিশ বাহিনী। ১৯৫৭ সালে শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভির শাসনামলে সাভাক প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক বিরোধীদের দমন এবং শাহের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা। সিআইএ এবং মোসাদের সহায়তায় প্রশিক্ষিত এই বাহিনী তাদের নিষ্ঠুর পদ্ধতির জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেছিল।

ইরানের রাজনৈতিক কর্মী, শিক্ষার্থী, বুদ্ধিজীবী এবং যারাই রাজতন্ত্রবিরোধী কথা বলত, তারাই সাভাকের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতো। এভাবে বিরোধীদের নজরদারি, বাকস্বাধীনতা হরণ, সেন্সরশিপ, নির্যাতন এবং কারাবন্দী করার নীতি এক ভয়াল

রেজা শাহের গুপ্ত বাহিনি সাবাক পরিচালিত 'গোপন কারাগার', বর্তমানে জাদুঘর। সাবাকের হাতে বন্দিদের মাকশট।

দমনমূলক ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ১৯৭০-এর দশকের মধ্যে সাভাকের ক্ষমতা এবং নিষ্ঠুরতা ইরানি জনগণের তীব্র অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ইরানি ইসলামি বিপ্লবে শাহের পতনের অন্যতম কারণ ছিল সাভাক। ফারসি দিনপঞ্জি অনুযায়ী বাইশে বাহমান অর্থাৎ ১১ ফ্রেব্রুয়ারি ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লবের পর সাভাককে বিলুপ্ত করা হয়। সাভাক প্রধানকে আটক করা হয়। বিচারে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।

জেনারেল অগাস্টো পিনোশে ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলেন্দের সরকারকে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করে। তিনি ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চিলি শাসন করেন। পিনোশের শাসনামলে গুপ্ত পুলিশ, বিশেষ করে দেশটির জাতীয় গোয়েন্দা অধিদপ্তর (ডিনা) এবং পরে জাতীয় তথ্য কেন্দ্র (সিএনআই), ভিন্নমত দমন এবং পিনোশের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য কুখ্যাত হয়ে ওঠে।

১৯৭৪ সালে পিনোশের ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই ডিনা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম থেকেই ডিনা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে কাজ করেছে। ডিনা ছিল দেশটির রাজনৈতিক বিরোধিতা নির্মূল করার হাতিয়ার। ম্যানুয়েল কনট্রেরাসের নেতৃত্বে ডিনা ব্যাপক নজরদারি, অপহরণ, নির্যাতন এবং হত্যা তৎপরতায় লিপ্ত ছিল। বাম আন্দোলনের সদস্য, শ্রমিকনেতা, বুদ্ধিজীবী এবং পিনোশের সরকারের বিরোধিতায় জড়িত হিসেবে সামান্য সন্দেহ হলেই তাকেই লক্ষ্যবস্তু বানাত ডিনা।

ডিনার সদস্যরা ত্রাস ছড়ানোর জন্য নির্মম পদ্ধতি ব্যবহার করত। শঙ্কহাতে বিরোধীদের বা বিরোধী ভাবাপন্নদের দমন করত। হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অনেকেই ভিলা গ্রিমালডি এবং লস্ত্রেস ৩৮-এর মতো 'আয়নাঘরে' আটক করে নির্যাতন চালানো হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের অনেকেই প্রায়ই 'অদৃশ্য' বা 'গুম' করে ফেলা হতো। পরিবারগুলো তাদের প্রিয়জনদের সন্ধানে হন্যে হয়ে উঠলেও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো উত্তরই পেত না।

সরকার চিলির দেশত্যাগী ভিন্নমতাবলম্বীদের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য দেশের বাইরেও অপারেশনও চালাত।

পিনোশের শাসনামলে আনুমানিক ৩,০০০ মানুষ নিহত বা নিখোঁজ হয়েছে। কয়েক হাজার মানুষ নির্যাতিত বা বন্দী হয়েছে। নির্যাতনের অংশ হিসেবেই নারীদের যৌন সহিংসতার শিকার হতে হয়েছে। সরকারের এই কাজগুলো জনগণের মধ্যে ভয় ছড়িয়ে দেয়। তার মুখবন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। ফলে প্রায় দুই দশক ধরে রাজনৈতিক বিরোধিতাকে কার্যত স্তব্ধ করে দেয় পিনোশে।

১৯৯০ সালে পিনোশে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান এবং চিলি গণতন্ত্রের দিকে যাত্রা শুরু করে। রেটিগ রিপোর্ট এবং ভ্যালেচ রিপোর্টের মতো সত্য কমিশনগুলো তার শাসনামলে সংঘটিত ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের নথিপত্র তৈরি করে। ডিনা এবং সিএনআইয়ের কিছু সাবেক কর্মকর্তা, যেমন ম্যানুয়েল কনট্রেরাস, তাদের অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন। তবে ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুর আগপর্যন্ত স্বাস্থ্যগত সমস্যার অজুহাত দেখিয়ে পিনোশে গুরুতর শাস্তি এড়িয়ে যান। পিনোশের গুপ্ত পুলিশ চিলির ইতিহাসের একটি অন্ধকার অধ্যায় হিসেবে রয়ে গেছে।

গেস্টাপো ছিল নাজি জার্মানির বিশেষ পুলিশ বাহিনি। এই সংস্থাটি জার্মানি এবং এর দখলকৃত অঞ্চলগুলোতে নাজি বিরোধীদের নির্মমভাবে দমন করেছে। গেস্টাপো এবং সিকারহাইটসডিয়েনস্ট সংক্ষেপে এসডি–যৌথভাবে পুরো ইউরোপে ইহুদিদের গ্রেপ্তার অভিযান চালাত। পরে তাদের গণহত্যা শিবিরে পাঠানোর দায়িত্বও পালন করেছিল।

১৯৩৩ সালে নাজিরা ক্ষমতা গ্রহণ করলে তৎকালীন প্রুশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হারমান গোয়েরিং প্রুশিয়ান নিয়মিত পুলিশ বাহিনী থেকে রাজনৈতিক ও গোয়েন্দা ইউনিটগুলোকে আলাদা করে। হাজার হাজার নাজিকে তাদের পদে ভর্তি করে এবং ২৬ এপ্রিল, ১৯৩৩-এ নিজ ব্যক্তিগত কমান্ডের অধীনে গেস্টাপো হিসেবে তাদের পুনর্গঠিত করে। হাইনরিখ হিমলারকে ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে গোয়েরিংয়ের গেস্টাপো বাহিনীর কমান্ডে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

গেস্টাপোকে নাগরিক অধিকারের ধার ধারতে হতো না। এ বাহিনীর 'প্রতিরোধমূলক গ্রেপ্তার' করার ক্ষমতা ছিল। গেস্টাপোর তৎপরতা প্রচলিত আইন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হতো না হাজার হাজার বাম বুদ্ধিজীবী, ইহুদি, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, রাজনৈতিক দল, পাদ্রি এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের গেস্টাপো গ্রেপ্তার করে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে চালান করে দেয়। বন্দীরা সেখান থেকে চিরতরে নিখোঁজ হয়ে যান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাজি দখলকৃত অঞ্চলগুলোয় গেস্টাপো গেরিলা কার্যকলাপ দমন করেছে। পাশাপাশি বেসামরিক মানুষজনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

ইউরোপ মধ্যপ্রাচ্য ও লাতিন আমেরিকায় গুপ্ত পুলিশের ঘাতক ছায়া

সৈয়দ মূসা রেজা

রোমানিয়ার গুপ্ত পুলিশ।

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের সুন্দর একটি দেশ রোমানিয়া। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং বলকান উপদ্বীপের উত্তরে অবস্থিত দেশটির মধ্য ও উত্তরাঞ্চলে দীর্ঘ মনোরম পর্বতমালা রয়েছে। রোমানিয়াকে বরাবরই ইউরোপের অন্যতম বিচ্ছিন্ন ও পিছিয়ে পড়া দেশের তালিকায় ফেলা হয়। ইতিহাসের দীর্ঘ সময় ধরে দেশটি শাসন করেছে বিভিন্ন বিদেশি শক্তি। এসব শাসক রোমানিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতি নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজনই মনে করেনি।

১৯৪০-এর দশকে রোমানিয়ার ক্ষমতার পটপরিবর্তন হয়েছিল। রোমানিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি সে সময় ক্ষমতায় বসে। তারপরও রোমানিয়ার বরাত খোলেনি। পরিস্থিতির তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। রোমানিয়ার প্রথম শাসক দলটি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের আদল বা মডেল অনুসরণে মেতে ওঠে। ১৯৬০-এর দশকে রোমানিয়া নিজস্ব শাসনব্যবস্থা তৈরি করে। এই সময়েই নিষ্ঠুর একনায়ক নিকোলাই চশেস্কু রোমানিয়ায় লৌহ কঠিন শাসন কায়েম করে। চশেস্কুর নীতিমালা রোমানিয়াকে আরও হতদরিদ্র দশার দিকে ঠেলে দেয়। একই সাথে চলতে থাকে দমনপীড়ন। রোমানিয়ার আমজনতা মনে করত, তাদের ঘাড়ে দেশ এক বিশাল জগদ্দল পাথর হয়ে চেপে বসেছে। এ পাথর সরানোর সক্ষমতা তাদের নেই।

চশেস্কুর শাসনকালে (১৯৬৫-১৯৮৯) রোমানিয়ার অধিকাংশ নাগরিকই কঠিন কষ্টের মুখোমুখি হয়েছিলেন। শীতকালে ঘরবাড়ি ও অফিস-আদালতে তাপব্যবস্থা ঠিকভাবে কাজ করত না। বেশির ভাগ সময়ই ঘরের তাপমাত্রা সচরাচর ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে উঠত না। শীতকাল, ফলে ঘরের ভেতরেও কোট, টুপি এবং দস্তানা পরে ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে কাঁপতে কাজ করতে হতো। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের নামে চশেস্কুর নির্দেশে রাতে রাস্তায় আলো বন্ধ রাখা হতো। নাগরিকদের ঘরের ভেতর মাত্র এক বা দুটি ৪০ ওয়াটের বিদ্যুৎ বাতি জ্বালিয়ে চলতে হতো।

ময়দা, চিনি এবং গোশতের মতো নিত্যপণ্যগুলোর রেশনের মাধ্যমে কেনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। পরিবারপিছু তিন-চার মাসে মাত্র একখণ্ড ছোট মাখনের টুকরো জুটত। কসাইদের দোকানে শুধু শূকরের মাথা এবং পায়ের অংশ বিক্রি করা হতো, যেন প্রাণীগুলোর বাকি দেহাংশ অদৃশ্য হয়ে গেছে। বাস্তবে সেই খাদ্য পণ্যগুলো রপ্তানি করে অর্থ কামাত চশেস্কুর সরকার।

অর্থনীতির লাগাম ছিল রাষ্ট্রের হাতে, কিন্তু রোমানিয়ার আমজনতার জীবনমান উন্নত করার দিকে তাদের মনযোগ ছিল না। দেশটির জনগণের জীবন দুঃখ-দুর্দশায় কানায় কানায় ভরপুর থাকার পরও চশেস্কুর খায়েশের শেষ ছিল না। উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আরও বেশি বেশি ত্যাগ স্বীকার করার দাবি জানাত রাষ্ট্র। চশেস্কুর উচ্চাভিলাষী প্রকল্প এবং শিল্পায়ন পরিকল্পনার জন্য নেওয়া বিদেশি ঋণ শোধ করতে ত্যাগের এই কীর্তন গাওয়া হতো। এই প্রকল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল হাজার হাজার ঐতিহ্যবাহী গ্রাম ধ্বংস করে বিশাল কমিউনিস্ট পার্টির অফিস ভবন নির্মাণ। হতভাগা গ্রামবাসীদের তাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে গ্রীষ্মকালীন কারখানার কাজে নিয়োগ করা হয়। ধূসর শহুরে ডরমিটরিতে তাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

বুখারেস্টের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে 'সোশ্যালিস্ট ভিক্টরি অ্যাভিনিউ' তৈরির জন্য একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প শুরু হয়। ১৯৮৭ সালে এই প্রকল্পের কারণে ৪০,০০০ মানুষ তাদের বসতভিটা হারিয়েছিল। একই সাথে প্রাচীন অনেক গির্জা ও মঠ ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এই অ্যাভিনিউর প্রধান অংশে চশেস্কু পরিবারের জন্য রাজকীয় প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। এ প্রাসাদ বানাতে ৭২০ মিলিয়ন ডলারের বেশি খরচ করা হয়েছিল। চশেস্কু এবং তার স্ত্রী ঘন ঘন নির্মাণ সাইটে গিয়ে নতুন নতুন ব্যয়বহুল পরিবর্তনের নির্দেশনা দিতেন। তাদের এমন সব খায়েশ মেটাতে ১৫,০০০ শ্রমিককে দিনরাত কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

রোমানিয়ার সাধারণ মানুষজন হতদরিদ্র দশায় জীবন কাটালেও চশেস্কু পরিবার জীবনযাপন বিলাসিতায় ভরপুর। ৪০ কক্ষের প্রাসাদে সুইমিংপুল, বক্সিং রিং এবং টেনিস কোর্ট ছিল। তাদের পোশাকের তাকগুলো দামি দামি পশ্চিমা পোশাক-আশাকে উপচে পড়ত। প্রাসাদের দেয়ালগুলো সাজানো হয়েছিল মূল্যবান চিত্রকর্ম দিয়ে।

চশেস্কুর আত্মীয় ও স্বজনবর্গও তার শাসনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে। প্রায় ৪০ জন আত্মীয় উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরি পেয়েছিলেন। তার ভাইদের একজন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর ডেপুটি, আরেকজন নিরাপত্তা বাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল এবং তৃতীয়জন রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান পদে আসীন হয়েছিলেন। তার স্ত্রী এলেনা রাষ্ট্রী এবং দলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ বাগিয়ে নিয়েছিলেন। রোমানিয়ায় চশেস্কুর পরেই সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন এলেনা।

চশেস্কু দম্পতিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে শিশুরা ফুলের তোড়া নিয়ে গালে চুমু দিয়ে তাদের স্বাগত জানাত, লোকচক্ষুর আড়ালে ফুল নিয়ে অংশ নেওয়া এ শিশুদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিত করা হতো যে তারা কোনো সংক্রামক অসুখবিসুখে ভুগছে না।

১৯৩০-এর দশকের সোভিয়েত আদলে রোমানিয়ায় নতুন এক সমাজ গড়ার ধান্ধা ছিল চশেস্কুর। তার সাধ ছিল এমন মানুষ গড়বেন, যারা সব আদেশ বিনা দ্বিধায় মেনে চলবে। রোমানিয়ার এক ইতিহাসবিদ বলেছিলেন, এ ধরনের সমাজের জন্য মানুষকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে দলের ওপর নির্ভরশীল করতে হবে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা স্বাভাবিক মানবিক প্রতিক্রিয়ার ছিটেফোঁটা থাকলেও তারা এই নতুন সমাজের বিরোধিতা করবে।

ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার জন্য চশেস্কুর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ছিল তার গোপন পুলিশ বাহিনী, 'সেকুরিতাতে'। এই বাহিনী তার প্রতি দারুণ অনুগত ছিল। বাহিনীর অনেক সদস্যকে এতিমখানা থেকে শিশুকালেই দলে নেওয়া হয়েছিল। তাদের বড় করা হয়েছিল এই বিশ্বাস দিয়ে যে চশেস্কুই তাদের আসল বাবা এবং তার পরিবারই তাদের একমাত্র পরিবার। তাদের শেখানো হয়েছিল, চশেস্কুর জন্য জীবন দিতেও পিছপা হওয়া যাবে না।

জনশক্তির বিবেচনায় রোমানিয়ার সেনাবাহিনী বড় হওয়া সত্ত্বেও দিনশেষে চশেস্কু বেশি ভরসা করতেন তার গোপন পুলিশ বাহিনী 'সেকুরিতাতে'র ওপর। তুলনামূলকভাবে 'সেকুরিতাতে' সদস্যদের সুযোগ-সুবিধার বন্যায় ভাসিয়ে *এরপর পৃষ্ঠা ১৪ ও ১৫*